॥ উৎসর্গ ॥

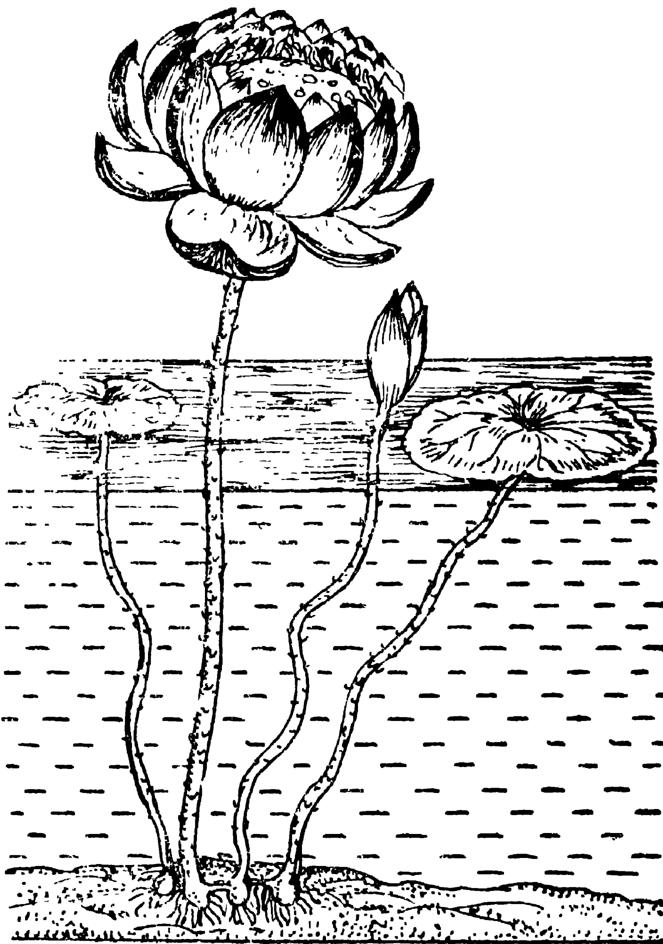
আমার মার করকমলে, যাঁর স্নেহ, মমতা
ও আশীর্বাদ আমাকে অনুক্ষণ ঘিরে থাকে।

ডক্টর সাহার অন্যান্য বই

এক আত্মহত্যার পটভূমি (ত্রিপুরী)

বানথাঙী (কুকি)

গোমতী



॥ এক ॥

টুইশনি থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে যখন আমার ছোট্ট ঘরটায় ঢুকছি তখন আমার ছাত্রী অঞ্জনা এসে আমার হাতে খামে আঁটা একটি পত্র তুলে দিলো।

খামটি উলটে পালটে দেখলাম ওটি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে এসেছে। ঘরে ঢুকেই তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে ফেললাম।

নিয়োগ পত্র। আমার চাকরী হয়েছে। স্কুল মাস্টারি।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গেলাম। একটা পরিতৃপ্তি এলো সমস্ত দেহ-মনে। হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। এ রকম একটা চিঠির জন্যে গত পাঁচটি বছর ধরে অপেক্ষা করছিলাম। কত দিন রাত স্বপ্ন দেখেছি। কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি।

আজ ওই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ আমার হাতে ধরা দিয়েছে। মাসের শেষে জীবিকার একটি নিশ্চিত সংস্থান।

চিঠিটা আবার খামে পুরে ছুটে গেলাম অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী মশায়ের কাছে। ভদ্রলোক অতি সজ্জন। সকলে ওঁকে মানে, শ্রদ্ধা করে।

তিনি ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়া টানছিলেন। গিয়েই টুক করে একটা প্রণাম করলাম। তিনি বললেন, 'কি ব্যাপার?'

বললাম, 'আমার চাকরী হয়েছে। স্কুল মাস্টারি।'

অম্বিকাবাবু বললেন, 'তাই নাকি। ভালো খবর, খুব ভালো খবর। শহরেই তো?'

বললাম, 'না। মন্নু থানার অধীন, ছামন্নু জুনিয়র বেসিক স্কুলে।'

অম্বিকাবাবু বললেন, 'তা হোক্। সরকারী চাকরী করলে শহরের বাইরে যেমন যেতে হবে, তেমনি আবার ট্রান্সফার হলে শহরে আসার সুবিধেও আছে।'

আমি তখন ছামনু না কোথায়, এসব ভাবছি না। শুধু ভাবছি আমার চাকরী হয়েছে। পায়ের তলায় একটা শক্ত মাটি পেলাম।

নিয়োগ পত্রটি অম্বিকাবাবুর হাতে তুলে দিলাম। চিঠিটা পড়ে খুব খুশি হলেন উনি। সঙ্গে-সঙ্গে পাঁজি-পুঁথি দেখে তিনদিন পর বুধবারের উষা যাত্রা করার জন্যে নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'ওখানে থাকা-খাওয়ার জন্য কাল-পরশু কিছু জিনিস-পত্র কিনে নাও। কি রকম জায়গা হবে কিছুইতো বলা যায় না। দরকার পরলে নিজে রেঁধেও খেতে হতে পারে।'

আমি আকাশ পাতাল ভাবছি, জিনিস-পত্র কেনার এত টাকা পাব কোথায় ?

আমার মুখের দিকে নিথর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আনমনে কিছুক্ষণ ভাবলেন অম্বিকা বাবু। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তোমার কাছে তো অত টাকা নেই বোধ হয়। আমার কাছ থেকে একশ' টাকা নিয়ে নাও। বেতন পেয়ে পাঠিয়ে দিও।'

অম্বিকাবাবুর এ অযাচিত সাহায্যের জন্য অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এরাই তো মানুষ।

যেখানে-যেখানে ট্যুইশনি করতাম পরদিন তাঁদের সবাইকে খবরটা জানালাম। ওঁরা সবাই আমার এ সুখবরে বেশ খুশি। ওঁদের কাছে যে পাওনা হয়েছিল, কেউ পুরো মাসের মাইনে দিয়ে দিলেন,আবার কেউ দিলেন মাস কাবারে পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। সবার কাছে চেয়ে নিলাম আশীর্বাদ।

অম্বিকাবাবুর দেয় টাকা আর আমার কাছে যে কিছু টাকা আছে তা মিলিয়ে ডেক, কড়াই, থালা-বাসন, এটা-ওটা কিনলাম।

মঙ্গলবার দিন ধর্মনগরগামী বাসের কাউন্টার থেকে একটা টিকেট কিনে নিলাম মনুর।

পরদিন উষা যাত্রা করলাম। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দুর্গা-দুর্গা বলে মটরষ্ট্যাণ্ডে এসে উঠে বসলাম ধর্মনগরগামী বাসে।

ধীরে ধীরে সমস্ত শহরটা একটু একটু করে জেগে উঠছে। পূব

দিকের সোনালী সূর্যের কয়েকটা জ্যোতির্ময় রেখা এসে পড়েছে বাসটার উপর।

সকাল ছটায় ভস্‌ভস্‌ শব্দ করে, হর্ণ দিতে দিতে আমাদের বাসটা ছেড়ে দিলো।

একটা জানালার কাছে সিট পেয়েছি। দ্রুত গতিতে বাসটা আগরতলা শহর ছেড়ে যখন খয়েরপুরের কাছাকাছি এলো তখন ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতিচারণে ডুবে গেলাম।

পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের বাড়ি ছিল, নোয়াখালীর রামগঞ্জ থানার অধীন করপাড়া গ্রামে। আমার বাবা রবিশঙ্কর বাঁড়ুজ্যের পেশা ছিল যজমানি। আমারা ছিলাম দু'ভাই আর দু'বোন। আমাদের অবস্থা বেশী সচ্ছল ছিল না। জমি ছিল মাত্র আড়াই কাণি। ওগুলো বর্গা দিয়ে চাষ করাতেন বাবা। যা ধান পাওয়া যেত আমাদের ছ'টি প্রাণীর সারাবছরের গ্রাসাচ্ছাদনের সংকুলান হতো না। তাই ছাপোষা বাবা যজমানি করে যা পেতেন তা মিলিয়ে সতী-সাধ্বী মা আমার কায়-ক্লেশে অপোগণ্ড ছেলেমেয়েদের অতিকষ্টে লালন-পালন করতে লাগলেন। ধার কর্জ করে বাবা একদিন বিয়ে দিলেন আমার বড়দির।

দিদির বিয়ের একবছর পর মাত্র তিন দিনের জ্বরে আমাদের সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে বাবা চলে গেলেন পরপারে।

তখন আমার বয়স তিন বছর। দাদার বয়স সাত বছর আর ছোটদি দশ বছরের।

এবাড়ি ওবাড়ি মুড়ি ভেজে, চিড়ে কুটে কায়ক্লেশে আমাদের চারজনের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন মা।

বিধি বাম। যখন বড়দা দু পয়সা রোজগার করছেন তিনিও একদিন কলেরায় মারা গেলেন। ছোটদির বয়েস তখন চৌদ্দ-পনের।

হঠাৎ নোয়াখালীতে শুরু হলো দাঙ্গা। তখন ১৯৪৬ সাল।

সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা হিন্দুদের ধরে ধরে কলমা পরিয়ে তাদের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। তারা ছুটতে থাকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। হিন্দু মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় তারা। এদের খপ্পরে পড়লো আমার

ছোটদি। উপায় না দেখে আমার মা সতীত্ব রক্ষা করতে পাশের এক কচুরিপানার ডোবায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এক রাত। পরদিন প্রতিবেশী এক প্রাচীন মুসলমানকে 'বাবা' ডেকে পার পেলেন মা। ওই ধার্মিক মুসলমানটি আমাদের নিয়ে গেলেন ওঁর বাড়ি। তিনি বেশ কয়েকদিন আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।

চারদিকে মারামারি—প্রচণ্ড উত্তেজনা। গভীর রাতে শোনা যাচ্ছিলো 'আল্লাহু-আকবর' 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি। কিন্তু অনেক খোঁজা খুঁজি করে ছোটদির কোন হদিস পাইনি।

এদিকে মহাত্মাগান্ধী গিয়েছিলেন নোয়াখালীতে। নৌকোতে, হেঁটে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটেছিলেন উনি। সংখ্যালঘুদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিছুদিনের জন্য হিন্দুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল।

দেশবিভাগের পর বুভূক্ষু নিঃস্ব সংখ্যালঘুরা চৌদ্দ পুরুষের ভিটে-মাটি ছাড়তে লাগলো। কেউ চলে গেল পশ্চিমবঙ্গে, কেউ আসামে, আবার কেউ ত্রিপুরায়।

আমার কাকা নারায়ণচন্দ্র বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে আমরা এক বাড়িতেই থাকতাম। ওঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন মা। জিজ্ঞেস করলেন, ওঁরা হিন্দুস্থানে যাবেন কিনা?

নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন কাকাবাবু, 'না, আমরা কোথাও যাবো না। দেশ ছেড়ে চলে গেলে আমাদের জমি-জমা কে দেখবে? তাছাড়া এ অবস্থায় কেউ জমি কিনবেও না। যদি কেউ কেনেও তবে যথার্থ দাম পাব না।'

মা কাকাবাবুকে সানুনয়ে অনুরোধ করেন, 'আপনি দয়া করে আমাদের আড়াই কাণি জমি দেখবেন। এ জমিগুলোর দলিল-পরছা দিয়ে গেলাম। আমরা ত্রিপুরায় যাবো। সময় মতো আমাদের জমিগুলো বিক্রি করে টাকাগুলো পাঠিয়ে দেবেন।'

একদিন প্রতিবেশী কিছুলোকের সঙ্গে আমাকে নিয়ে মা চলে এলেন ত্রিপুরায়। দিনটা ছিল ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭ সাল।

আমরা এক মাস রিলিফ ক্যাম্পে ছিলাম। একদিন ওখানকার

এক কর্মকর্তার চেষ্টায় মৃণালকান্তি ভট্টাচার্যের বাড়িতে ঝি-এর চাকরী পেলেন আমার মা।

মৃণালবাবুর এক দোকান ছিল গোলবাজারে। মুদি দোকান। বাড়ি ছিল জগহরিমুড়ায়। তখন খুব বেশী সচ্ছল ছিলেন না উনি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে উদ্বাস্তুদের কনট্রাক্টারের কাজ করে রাতারাতি ধনী হয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

আমি আমাদের গ্রামের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তাম। মা একদিন মৃণালবাবুর সঙ্গে আলাপ করে ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে আমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

বছর দুয়েকের মধ্যে পড়াশোনায় আমি বেশ সুনাম অর্জন করি। আমার পরীক্ষার ফলাফল দেখে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রদ্ধেয় সতীনাথ ভরদ্বাজ মশায় আমার বেতন সবটাই মকুব করে স্কুল থেকে বই-এর ব্যবস্থা করে দেন। ঝি এর বেতন থেকে আমার জামা-প্যান্টের খরচ যোগাতেন মা।

স্কুলে সব ক্লাশেই আমি প্রথম অথবা দ্বিতীয় হতাম। সকল শিক্ষক মশায়েরা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি যখন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেই তখন প্রধান শিক্ষকমশায় স্কুলের 'পুওর ফাণ্ড' থেকে পরীক্ষার ফিসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৯৫৭ সালে আমি প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা পাশ করি। তারপর চাকরীর জন্য মাকে নিয়ে এ-আফিস, ও-আফিসে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই। সবাই 'দেখব—দেখব' বলেই খালাস।

তখন ত্রিপুরায় 'টেরিটরিয়েল কাউন্সিল বা ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ'। গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু স্কুল খুলছে।

এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের হর্তা-কর্তা ছিলেন শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রকুমার রায়। মাকে নিয়ে ওঁর কাছে আমাদের দৈন্যের কথা বুঝিয়ে বলেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় উনিও 'দেখবো' বলে এক কথায় বিদায় দিলেন আমাদের।

ত্রিপুরার টেরিটরিয়েল কাউন্সিলের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার

ছিলেন শ্রদ্ধেয় নন্দলাল দেববর্মন, যিনি 'নন্দলাল কর্তা' নামে সমধিক পরিচিত। মাকে নিয়ে ওঁর কাছেও আমাদের নিঃস্ব অবস্থার কথা খুলে বললাম। উনি কানে একটু কম শুনতেন। আমাদের সব কথা শুনতে পেয়েছিলেন কিনা জানি না। নিরুত্তাপ গলায় বললেন, 'আচ্ছা দেখবো।'

চাকরীর জন্যে হেথা-হোথায় লাটিমের মতন ঘুরছি। কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা'।

দুঃখে, শোকে, ক্ষোভে, মা খুব মুষড়িয়ে পড়লেন। তদুপরি মৃণাল বাবুর বাড়িতে অতিরিক্ত খাটুনিতে বাতরোগে আক্রান্ত হলেন মা। প্রথম-প্রথম বাত-ব্যথা নিয়ে কাজ করেছেন উনি। পরে কাজ করতে অপারগ হয়ে পড়ায় একদিন মৃণালবাবুর স্ত্রী মাকে জি. বি. হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

এদিকে আমার প্রতি চললো নির্যাতন আর নিষ্পেষণ। আমি যেন তাঁদের কাছে বোঝা স্বরূপ। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর আমি এঁদের ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়াতাম। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনা মোটেই করতো না। বড়লোকের সন্তান-সন্ততিরা যা হয়। তারা মার কাছে নালিশ জানাতে থাকে আমি নাকি তাদের পড়াতে পারি না। এরা একজন তৃতীয় শ্রেণী এবং অন্যজন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। তখন আমাকে তাড়াবার জন্যে বড়লোক গিন্নী উঠে পরে লেগে গেলেন। একদিন মৃণালবাবু আমাকে ডেকে বলে দিলেন, 'বাপুহে, তুমি অন্য কোথায়ও থাকার ব্যবস্থা করো।'

দু'মুঠো ভাতের জন্যে খুঁজতে-খুঁজতে বনমালীপুরের অম্বিকাচরণ চক্রবর্তী মশায়ের বাড়িতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছেলে-মেয়ে পড়ানোর বিনিময়ে একটা জায়গা পেলাম।

মৃণালবাবু চাকরী পাওয়া অবধি ওঁর বাড়িতে আমাকে থাকতে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যেন তেন প্রকারেণ আমায় তাড়াতে রাতারাতি স্বামী বড়লোক হওয়া গিন্নীর 'রণং দেহি' মূর্তি দেখে স্বামী বেচারা আমায় অন্যত্র থাকার জায়গা খুঁজতে বলেছিলেন।

তখন আমি বুঝলাম আগুনে না পুড়লে সোনা যেমন মূল্যবান হয় না, তেমনি দুঃখে না পরলে মানুষ চেনা যায় না।

ওদিকে আমার মা বাতরোগে ভুগতে থাকে অনেকদিন। উনি যেন কেমন হয়ে গেছেন! তাই মৃণালবাবুর স্ত্রীর দুর্ব্যবহারের কথা মাকে কিছুই জানালাম না।

হাসপাতালের চিকিৎসায় মার কিছুই হচ্ছিল না। বহুদিন রোগ ভোগের পর একমাস মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে, আমায় অকূল সমুদ্রে ফেলে, ইহলোকের মায়া-মমতা কাটিয়ে সাধনোচিত ধামে চলে গেলেন মা।

সদ্যোজাত শিশুর মতন মার সঙ্গে আমার যোগসূত্র এক মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে গেল।

তখন আমি একা। দীর্ঘপথ সামনে। দূর থেকে দূরে বিস্তৃত। কে জানে, কতোদিন চলতে হবে একটানা পথ বেয়ে।

দেশে কাকাবাবুর কাছে সব জানিয়ে পত্র লিখলাম। কিছু টাকা চাইলাম শ্রাদ্ধ শান্তির জন্যে।

আমাদের আড়াই কাণি জমির বিনিময়ে আগেও কিছু টাকা চেয়েছিলাম। ওই সময়ে তিনি লিখেছিলেন, 'মুসলমানেরা তোমাদের জমি দখল করে নিয়েছে, তারা কিছুই দিচ্ছে না।'

এবার কাকাবাবু কিছু টাকা পাঠালেন। তাই দিয়ে শ্রাদ্ধ-শান্তি করে শুদ্ধ হয়েছিলাম।

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী আমার নম্র ব্যবহারে আর ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে দেখে বিশেষ খুশি। তিনি একদিন আমায় বলেছিলেন, 'বিমল, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতন। তুমি এক কাজ করো। যদি পার তবে তোমার হাত খরচার জন্যে অন্য জায়গায় দু-একটা ট্যুইশনি করতে পারো।'

অম্বিকাবাবু ছাপোষা নিরীহ বাঙালী কেরানী। খুব ভাল লোক তিনি। উনিও ওঁর স্ত্রীর কথায় সায় দিয়েছিলেন। ওঁদের ছেলে-মেয়েদের পড়িয়ে আরও তিনটা ট্যুইশনি করতাম।

মার মৃত্যুর পর আবার চাকরীর জন্য দরজায় দরজায় আফিসের কর্তাদের কাছে ধন্না দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হয় নি।

একদিন চৌদ্দ দেবতার নাম স্মরণ করে চীফএকজিকিউটিভ অফিসার নন্দলাল কর্তার বাড়িতে হাজির হলাম। তখন ভোর ছ'টা। দরজা খোলা। বাইরে কেউই নেই। তবুও সাহস করে গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। ওই দিনটির কথা মনে পড়লে আজও গা শিউরে ওঠে। পরে জেনেছি কর্তার তিনটি এ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে। আমাকে দেখে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ শব্দ করে তেড়ে আসে। আমি ভয়ে চিৎকার করে উঠলাম। আমার আর্ত চিৎকারে কর্তা আর ওঁর দু'ভৃত্য দৌড়ে এলো। এক ভৃত্য কুকুরটিকে সরিয়ে নেয়। ভৃত্যরা যদি না আসত ওইদিন আমার ভাগ্যে কি যে ঘটতো তা ভগবানই জানেন।

শ্রদ্ধেয় নন্দলাল কর্তা আমাকে নিয়ে বৈঠকখানায় গেলেন। তিনি আমাকে দেখে চিনেছেন বোধ হয়। মার শ্রাদ্ধের এক মাস পরের কথা। আমার মাথায় চুল নেই। তিনি আমার দিকে নির্ণিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কি যেন খুঁজছিলেন। এক অস্বস্তিকর অবস্থা আমার। হঠাৎ তিনি আমায় জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার চাকরী হয়নি?'

কুকুরের অনৈসর্গিক আক্রমণে আমি ভড়কে আছি। এর উপর কর্তার এরূপ নিথর দৃষ্টির চাহনি দেখে আমি কাঁদ কাঁদ স্বরে বললাম, 'না—কর্তা।' আমার চোখ দুটো অশ্রুভারে টলটল করছিল।

কর্তা ব্যথিত কণ্ঠে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মাথার চুল কামান কেন? তোমার কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল?'

এবার অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। কতোক্ষণ কেঁদেছি আজ আর তা মনে নেই। অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম।

কাঁদতে কাঁদতে আধো-আধো স্বরে 'মার বাতব্যাধি, দুঃখে-শোকে-ক্ষোভে মুহ্যমান, যন্ত্রণা আর কষ্ট পেয়ে মার জি বি হাসপাতালে মৃত্যু, মনিবের দুর্ব্যবহার, বাড়ি থেকে তাড়ানো, একস্থানে আশ্রয় প্রাপ্তি —ইত্যাদি' আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলো একটার পর একটা বিস্তারিত ভাবে সবিনয়ে কর্তার কাছে নিবেদন করলাম।

কর্তা আরও কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার মুখপানে কেন যে চেয়েছিলেন আর কিইবা দেখতে পেয়েছিলেন তা তিনিই জানেন।

হঠাৎ কর্তা আমায় জিজ্ঞেস করেন, 'ওহে বাপু, তুমি মাস্টারির চাকরী করবে কি?'

আমি শশব্যস্তে মাথা নেড়ে বললাম, 'হ্যাঁ কর্তা।'

কর্তা আমার নাম, ঠিকানা নিয়ে একটা শ্লিপে নোট করে নিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের প্রিন্সিপাল অফিসার ইন্দ্রকুমার রায় মশায়কে টেলিফোনে আমার নাম, ঠিকানা দিয়ে বলে দিলেন, 'আমি চাই ছেলেটি সাতদিনের মধ্যে জুনিয়র বেসিক স্কুলে যেন মাস্টারির চাকরী পেয়ে যায়।'

ওদিক থেকে টেলিফোনে উচ্চৈঃস্বরে ভেসে এলো, 'আচ্ছা স্যার।'

টেলিফোন নামিয়ে কর্তা আমায় বলে দিলেন, 'যাও, মাস্টারির চাকরীর জন্য তৈরী হয়ে নাও।'

আমি গড় হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে কর্তার আশীর্বাদ চাইলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'শোন বিমল, তোমার মা ঝি-এর কাজ করে তোমায় মানুষ করেছেন। তুমিও অনেক দুঃখ পেয়েছ। আমি আশীর্বাদ করছি তোমার মঙ্গল হোক্।'

নত হয়ে কর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অম্বিকাবাবুর বাড়ি ফিরে এলাম।

কথামতো সাতদিনের মধ্যে শিক্ষকের চাকরীর নিয়োগ পত্রটি পেয়ে যাই।

অকস্মাৎ কণ্ডাকটারের চিৎকারে আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। ও চেঁচিয়ে বলছে, 'মনু—মনু—মনু।'

দ্রুতলয়ে তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমি বললাম, 'আমি মনু নামবো। আমার বেডিং আর জিনিসপত্রগুলো বাসের উপর থেকে নামিয়ে দাও ভাই।'

কণ্ডাকটার লাফ দিয়ে বাসের উপরে উঠে আমার বেডিং আর অন্যান্য জিনিসপত্রের মোটটি নামিয়ে দেয়।

ওদিকে বাসটি ডিজেলের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, ভস্‌-ভস্‌ শব্দ করে করে ছুটে চললো ধর্মনগরের দিকে।

॥ দুই ॥

বাসটি চলে গেল।

ভাবছি ছামনু যাবো কেমন করে। অচেনা অজানা পথ।

একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে আরও মেঘ জড় হচ্ছিলো। যে কোন মুহূর্তে আবার ঝির-ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যেতে পারে।

ধর্মনগরগামী বাস থেকে কিছু ন্যাকা-ন্যাকা লোক নেমেছে। তাদের মধ্যে দু'জন আদিবাসী লোকও আছে।

ওদের মুখমণ্ডল গোলাকার। নাক নত ও চিপিট। গণ্ডদেশের অস্থি উন্নত, বক্ষ প্রশস্ত, বাহুযুগল মাংসল। এদের শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ এবং সুদৃঢ়। বর্ণ গৌর কিন্তু লাবণ্য বর্জিত। ওরা বিরল-শ্মশ্রু।

তাদের পরণে হাঁটু অবধি কাপড়। গায়ে ফুল হাতা কোটের মতো জামা। কাঁধে কাপড়-চোপড় ভর্তি এক-একটি জিন কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো। দুজনের হাতে বেতের লাঠি।

এদের জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই, আপনারা বলতে পারেন ছামনু এখান থেকে কতো কিলোমিটার ?'

একজন উত্তর দেয়, 'প্রায় বিশ কিলোমিটার।'

'কেমন করে যেতে হবে ?'

'হেঁটে হেঁটে যাওয়া ছাড়া তো কোন উপায় নেই। ছামনু হাটের দিন মাঝে মধ্যে জিপ চলে। কিন্তু আজ জিপের কোন আশা নেই।'

আমি ছামনুর দিকে চেয়ে দূরত্বের কথা ভাবছি আবার আকাশের দিকে চেয়ে বৃষ্টির কথাও চিন্তা করছি।

এমনি সময় এদের মধ্য থেকে একজন আমায় জিজ্ঞেস করে, 'ছামনু কোথায় যাবেন বাবু?'

আমি পকেট থেকে খুলে আমার নিয়োগপত্রটি তাদের দেখালাম। ওরা ফ্যাল-ফ্যাল করে কাগজটির দিকে চেয়ে রইলো। বুঝলাম ওরা কিছুই পড়তে পারেনি। তখন আমি তাদের বুঝিয়ে বললাম, 'আমি ছামনু স্কুলে মাস্টারির চাকরী পেয়েছি।'

ওরা আমায় জিজ্ঞেস করলো, 'আপনার বাড়ি কোথায়?'

আমি দরাজ গলায় বললাম, 'আগরতলা'।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা সোৎসাহে বলে উঠলো, 'আপনি কিছু ভাববেন না। ছামনু স্কুল থেকে আমাদের বাড়ি দু'কিলোমিটার দূরে। আমাদের ছেলে-পুলে আপনাদের স্কুলে পড়ে। আমরা আপনাকে সেক্রেটারীর বাড়ি পৌঁছে দেব।'

আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা আগরতলা থেকে আসছেন?'

'হাঁ।'

'কেন গিয়েছিলেন?'

'আমাদের জমির নকলের ব্যাপারে আগরতলা ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি আফিসে গিয়েছিলাম।'

আমি হাতে যেন স্বর্গ পেয়ে গেছি। মনে মনে বার কয়েক চৌদ্দ দেবতাকে স্মরণ করলাম। হাসিভরা মুখে তাদের বললাম, 'তাহলে তো ভালই হলো। একত্রে যাওয়া যাবে।'

মালপত্রগুলো ওদের দেখিয়ে বললাম, 'একজন মুটে নিয়ে নিন। আমার যে দু'টো মোট আছে।'

'আচ্ছা পরে দেখা যাবে। চলুন কিছু খেয়ে নি। যেতে যেতে বেলা পড়ে যাবে। হাতে হাতে মালপত্রগুলো নিয়ে ওই দোকানে যাই।'

তিনজনে একটা খাবার দোকানে ঢুকলাম।

তাদের একজনের নাম হাংরা চাকমা আর অন্যজনের নাম কালাছেদা চাকমা।

হাংরা চাকমা দোকানীকে উদ্দেশ করে বলে, 'ওহে হরিন্দরবাবু, আমাদের আড়াইশো করে চিড়ে, পাঁচটি করে কলা আর কিছু গুড় দিন।'

হরিন্দরবাবু তিনটি বড় বাটি করে চিড়ে, গুড় আর কলা দিল। আমরা তিনজনে মেখে-মুখে বেশ করে খেয়ে নিলাম।

কালাছেদা চাকমা আমায় জিজ্ঞেস করে, 'মাস্টারবাবু, আরও খাবেন?'

তড়িঘড়ি বললাম, 'না—না। আমি আর খেতে পারব না।'

হাংরা চাকমা আকুলকণ্ঠে বলে, 'খিদেয় কষ্ট পাবেন কিন্তু! পথে আর কোন ভাল খাবার দোকান নেই।'

হাংরা চাকমা আরও কিছু চিড়ে, কলা, গুড় দেবার জন্যে হরিন্দর বাবুকে বললো। হরিন্দরবাবু জিজ্ঞেস করেন, 'কতটুকু করে দেবো?'

কালাছেদা চাকমা বলে, 'যা দিয়েছেন আবার ততটুকু করে দিন।'

আমি বললাম, 'আমার পেট ভরে গেছে। আমার জন্য নেবেন না কিন্তু।'

কালাছেদা চাকমা বলে, 'তিন বাটিই দিন।'

তাদের পীড়াপীড়িতে অনিচ্ছা সত্বেও ওদের দেখাদেখি খেতে শুরু করলাম। খাওয়া শেষ করে আমরা সবাই পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম।

কালাছেদা চাকমা তার ব্যাগ থেকে একটা বাঁশের চোঙা আর কল্কি বের করে। হাংরা চাকমা ওর ব্যাগ থেকে বের করলো তামাক আর টিকে।

কালাছেদা চাকমা কল্কেতে তামাক ভরে টিকেতে অগ্নি সংযোগ করে। তারপর আমাকে বলে, 'তামাক খান মাস্টারবাবু।'

আমি নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললাম, 'না—না। আমি এখনও নেশা শুরু করিনি।'

হাংরা চাকমা খুশি খুশি গলায় বলে, 'আমাদের দেশে এসেছেন, একটু আধটু নেশা-টেশা করতে হবে বৈকি।'

আমি মনে মনে আতঙ্কিত হলাম। তবুও সাহসে ভর করে বললাম, 'আপনাদের অঞ্চলে যখন এসেছি তখন দেখবো'খন।'

এদিকে কালাছেদা চাকমা ওই বাঁশের চোঙার ফোকরে মুখ রেখে তরিবত করে দীর্ঘ টান দিয়ে চলেছে। মৌতাতে চোখ দুটো বেশ ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠেছে তার। তারপর ও হাংরা চাকমার হাতে বাঁশের চোঙাটি এগিয়ে দেয়। ও মৌজ করে সমানে তামাক টেনে চলেছে। ভক্ ভক্ করে এক রাশ তামাকের ধোঁয়া ছাড়ে ও। ধোঁয়ায়—ধোঁয়ায় তার মুখটা যেন ঢেকে গেছে।

এভাবে এক ঘণ্টা বিশ্রামের পর কালাছেদা চাকমা একজন মুটে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোন লোক পাওয়া গেল না। তারপর তারা দুজনে আমার মোটগুলো কাঁধে নিয়ে এগিয়ে চলে।

হাংরা চাকমা আমাকে উদ্দেশ করে বলে, 'আকাশ বেশ পরিষ্কার। সোনালী রোদের মেলা বসেছে। চলুন আর দেরী করা ঠিক হবে না।'

আমি ওদের আবার বললাম কুলী খুঁজতে। কালাছেদা চাকমা আমাকে বলে, 'যদি আমাদের মোট হতো তাহলে কি আমরা মুটে খুঁজতাম। আমাদের এতো পয়সা কোথায় মাষ্টারবাবু।'

কালাছেদা চাকমার কথার উত্তরে আমি আর কিছুই বলতে পারিনি। ওদের পিছুপিছু এগিয়ে চললাম ছামনুর দিকে।

আমরা ছৈলেংটা এসে একটা বটগাছের নিচে বিশ্রাম করলাম। ওদের সঙ্গে হেঁটে পাল্লা দিতে পারছিলাম না। তাই হাংরা চাকমা আমাকে বললো, 'আমাদের পাহাড়ী অঞ্চলে এসেছেন আরও জোরে হাঁটতে হবে। পাহাড় ওঠা শিখতে হবে।'

আমি দরাজ গলায় বললাম, 'নিশ্চয়ই শিখব।'

ওরা দুজনে ব্যাগ থেকে পান সুপারি বের করে চিবোতে শুরু

করলো। আমাকেও একখিলি পান দিলো। আমার পানের অভ্যাস নেই। তবুও তাদের দেখাদেখি পান চিবোতে আরম্ভ করলাম।

কালাছেদা চাকমা আমার দিকে ফিরে হঠাৎ বলে ওঠে, 'আজ কি বার মাস্টারবাবু?'

আমি সহজ গলায় বললাম, 'বুধবার।'

উল্লাসে কালাছেদা চাকমা বলে ওঠে, 'মাস্টারবাবু, আমাদের দেশে এলেন, আজ একটা ভাল অনুষ্ঠান দেখাব।'

আহ্লাদে বলে উঠলাম, 'কি অনুষ্ঠান?'

কালাছেদা চাকমা গম্ভীর গলায় বললো, 'আজ ছামনু বৌদ্ধ বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসব।' তারপর দ্রুতলয়ে ও বললো, 'চলো হে হাংরা চাকমা, চলুন মাস্টারবাবু, পা চালিয়ে চলুন।'

হাংরা চাকমা আমায় জিজ্ঞেস করলো. 'কয়টা বাজে মাস্টারবাবু।'

বললাম, 'দুটো বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকী।'

কালাছেদা চাকমা বললো, 'অনুষ্ঠানটি শুরু হবে তিনটায়। তাহলে আমাদের আরও আট কিলোমিটার যেতে হবে। পা চালিয়ে চলুন। আমরা অনুষ্ঠানের আগে পৌঁছুতে পারব।'

ওরা খুব দ্রুত এগিয়ে চললো। আমিও তাদের পিছু-পিছু প্রায় দৌড়ুতে-দৌড়ুতে এগোতে লাগলাম।

তীর বেগে ছুটতে-ছুটতে আমরা দু'টা পঞ্চাশ মিনিট নাগাদ ছামনু বৌদ্ধ বিহারে পৌঁছলাম।

ছামনু বাজার সংলগ্ন বৌদ্ধ বিহারে দেখলাম কয়েকশ' উপাসক এবং উপাসিকা বসে আছেন বিহার প্রাঙ্গণে। ওদের সামনে সাতজন কাষায় বস্ত্র পরিহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু চেয়ারে সমাসীন।

বিহারের ভিতরে দেখলাম এক অপরূপ বুদ্ধ মূর্তি। অর্ধ নিমীলিত নেত্রে ধ্যান গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট। দেখলে আপনা থেকেই পরম শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে।

হাংরা চাকমার চোখের ইঙ্গিতে হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি উপবিষ্ট উপাসক উপাসিকাদের পিছনে গিয়ে বসলাম।

উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে একজন মাইকে ঘোষণা করলেন, 'উপস্থিত উপাসক এবং উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এক্ষুণি 'কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান' শুরু হবে। এ অনুষ্ঠান হলো দান-বিনয় সম্মত বৌদ্ধ সমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে সবাই যোগ দিতে পারে। আপনারা নীরবে স্থির হয়ে বসুন। আরও শুনুন, আজকের অনুষ্ঠানের নায়ক হলেন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত অসিত মহাস্থবির। উনি এসেছেন শিলং থেকে। তিনিই আজকের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন।'

সবাই নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে।

পণ্ডিত অসিত মহাস্থবির মাইকে 'রতন সুত্ত' পাঠ শুরু করে দিলেন।

খীনং পুরানং নবং নত্থি সম্ভবং,
বিরতচিত্তা আযতিকে ভবস্মিং,
খীন বীজা অবিরূল হিচ্ছন্দা,
নিব্বন্তি ধীরা যথায়ং পদীপো।
ইদম্পি সংঘে রতনং পনীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু।

[যাঁদের পুরনো কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে, নতুন কর্ম উৎপন্নের হেতু নেই, পূর্ণভবে আসক্তি নেই। যাঁদের জন্ম নিরোধ হয়েছে এবং যারা তৃষ্ণা ধ্বংস হেতু আবার জন্মগ্রহণে বীতস্পৃহ, ওই প্রমুক্ত লোকেরা এ প্রদীপের মতন নির্বাণ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সমুদয় রত্ন থেকে এ সংঘ রত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ হোক্।]

তারপর চারজন উপাসক এবং তিনজন উপাসিকা হাতে চীবর নিয়ে এগিয়ে গেলেন। ওরা হাঁটু গেড়ে করজোড়ে ভিক্ষুদের কাছে বললেন,

ওকাসং ময়ং ভন্তে ইমং কঠিন চীবরং
দানং দেমি কঠিনং অত্থরিতুং।

[ভন্তে, আমরা এ সংঘকে কঠিন আস্তরণের নিমিত্ত কঠিন চীবর দান করছি।]

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বললেন, 'সাধু, সাধু। ইমং কঠিন চীবরং গম্হাম, কঠিনং অত্থরিতুং।'

[উত্তম, উত্তম। আমরা এ কঠিন চীবর গ্রহণ করলাম, কঠিন আস্তরণের জন্যে।]

বৌদ্ধভিক্ষুরা একে একে উপাসক এবং উপাসিকাদের হাত থেকে চীবরগুলো গ্রহণ করলেন।

এবার উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মাইকে একজন বলে উঠলেন, 'এবার পণ্ডিত অসিত মহাস্থবিরকে অনুরোধ করবো তিনি যেন দয়া করে কঠিন চীবর অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।'

পণ্ডিত অসিত মহাস্থবির মাইকের সামনে এসে সুরেলা কণ্ঠে বলতে শুরু করেন,

যো সন্নিসিনো বরবোধি মূলে
মারং সসেনং মহ তং বিজেত্বা,
সম্বোধি মাগঞ্ছি অনন্ত ঞানো
লোকুত্তমো তং পনমামি বুদ্ধং।

[যিনি শ্রেষ্ঠ বোধিবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে মহতী সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাপরাক্রমশালী মারকে (মৃত্যুরাজকে) পরাজয় করে সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, ওই অনন্তজ্ঞানী লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে বন্দনা করি।]

তারপর তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে থাকেন, 'ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অত্যাচারে, লোভী রাজন্যবর্গের বিলাসের খড়্গ তলে, নতুন বিজয়ী আর্যশক্তির বৈদিক যাগ-যজ্ঞের নিষ্ঠুর অনুশাসনে রক্তাক্ত, ক্লিষ্ট ভারত-বাসীরা যখন হাবুডুবু খাচ্ছিলো, তখনই তথাগত বুদ্ধ অসীম সাহস করে, উদার বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন কুসংস্কারের বাঁধ। ওই সময়ে ভারতের ধর্মভীরু মানুষেরা ওঁর কাছে পেল কর্মের দীক্ষা, মহাবীর্যের সাধনা আর প্রজ্ঞা পথের সন্ধান।

কথিত আছে এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে বর্ষাব্রত উদযাপন করছিলেন। বর্ষাবাস অন্তে পাবাবাসী ছিন্ন কাষায়

বস্ত্র পরিহিত ত্রিশজন ভিক্ষু তথাগতকে বন্দনা করার মানসে শ্রাবস্তী-নগরে এলেন। ওই অরণ্যবাসী ভিক্ষাজীবী ভিক্ষুরা কাহারও প্রদত্ত কোন বস্ত্র পরিধান করতেন না। শ্মশানে মশানে লব্ধ চীবরাদি দিয়েই লজ্জা নিবারণ করতেন ওঁরা। কেউ কিছু দিতে চাইলেও তাঁরা তা গ্রহণ করতেন না। এঁদের চীবরের অভাব দেখে পরম শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা এক ধনাঢ্যের পুত্রবধূ বিশাখা প্রমুখ ভক্তবৃন্দ চীবর দান করতে চাইলেন। ভগবান বুদ্ধ এই দানকে অনুমোদন করেন।

কথিত আছে ভক্তগণ একই দিনে সুতো কেটে, কাপড় বুনে, রঙ করে ওই ত্রিশজন পাবাবাসী ভিক্ষুদের ত্রিচীবর দান করেছিলেন। উহাকেই বৌদ্ধশাস্ত্রে 'কঠিন চীবর দান' বলা হয়।

তোমরা শুনে রাখো, ত্রিচীবর হলো, অন্তর্বাস, বহির্বাস এবং সাংঘাটি।

তদবধি বৌদ্ধ সমাজে কঠিন চীবর দানোৎসবের প্রচলন হয়। পরবর্তীকালে তথাগত বুদ্ধ এ দানের একটি সময়সীমা ঠিক করে দেন। উক্ত চীবর দান আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার পর থেকে কার্তিক মাসের পূর্ণিমার মধ্যেই সুসম্পন্ন করতে হয়। তাই এ মাসকে বৌদ্ধরা 'চীবর মাস'-ও আখ্যা দিয়েছেন।

বৌদ্ধ সমাজে যত প্রকার দান আছে এর মধ্যে কঠিন চীবর দানই সবচেয়ে বেশী পুন্যজনক।

উদ্যোক্তার পক্ষ থেকে একজন মাইকে ঘোষণা করলেন, 'আজকের মতো অনুষ্ঠান শেষ।'

সমবেত চাকমা পুরুষ এবং রমণীরা বুদ্ধকে গড় হয়ে প্রণাম করে একে একে যার যার বাড়ির দিকে রওনা হলো।

হাংরা চাকমা এবং কালাছেদা চাকমা এসে আমাকে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমি সবার সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলাম।

ওদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে, 'স্কুলের সেক্রেটারীবাবু আজ ছামনুতে নেই। তিনি কৈলাসহরে গেছেন। আগামীকাল সকালে আসবেন।'

তখন উদ্যোক্তাদের মধ্যে বলাবলি করে ঠিক করা হলো আমি যেন আজ রাতে ছামনু বাজারের ডাক্তার রথীন্দ্রনারায়ণ চাকমার বাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকি। আগামীকাল সেক্রেটারীবাবু এলে উনি আমাকে ওঁর কাছে পৌঁছে দেবেন।

ডাক্তার বাবুর পিছনে পিছনে ওঁর বাড়ির দিকে চললাম।

যেতে যেতে 'কঠিন চীবর দান' অনুষ্ঠানটির কথা ভাবতে লাগলাম। অনুষ্ঠানটি দেখে আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে গেছে। কি দেখলাম, এক অভূতপূর্ব দৃশ্য আর কি শুনলাম, এক অশ্রুতপূর্ব ভাষণ।

ডাক্তারবাবুর বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে রোদের স্পর্শ মুছে যেতে থাকে। কিন্তু এখনও ঝাঁজ আছে, যেমন আগুন নিভে যাবার পরও অনেকক্ষণ তাপ থাকে। এক-একটা গাছ ক্লান্ত—অবসন্ন। গাছের পাতাগুলো স্থির। রোদ চলে গেলেও অন্ধকার হতে অনেক দেরী।

॥ তিন ॥

পরদিন বেলা এগারোটা।

ছামনু জুনিয়র বেসিক স্কুলের সেক্রেটারী ভগবানচন্দ্র দেওয়ান মশায়ের বাড়ি গিয়ে পৌঁছলাম। উনি কৈলাসহর থেকে সকাল দশটায় বাড়ি এসে পৌঁছেছেন।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর আমার নিয়োগপত্রটি ওঁকে দেখালাম। ওটা পড়ে তিনি খুব খুশি। তিনি বললেন, 'ভালই হলো। আমরা অনেকদিন থেকে একজন শিক্ষকের জন্যে দরবার করে আসছি। 'দেব-দেব' করে আর দিচ্ছিলেন না।'

একটু থেমে তিনি আমায় বলেন, 'আপনারা শহুরে লোক। গ্রামে থাকবেন তো?'

সবিনয়ে বললাম,'যদিও আমি এতোদিন শহরে বাস করেছি, ওখানে

আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। আমি মাতৃ-পিতৃহীন এক গরীব বামুনের ছেলে। আমার ভাই বোন কেউ নেই।' শেষের কথাগুলো বলতে বলতে আমার গলার আওয়াজ ভারী হয়ে উঠলো।

সেক্রেটারীবাবু অভিভূত হয়ে আমার জীবনের কিছু ইতিহাস জানতে চাইলেন।

তখন নোয়াখালীর অবস্থা থেকে শুরু করে চাকরী পাওয়া অবধি সংক্ষেপে আমার করুণ জীবন কাহিনী ধীরে ধীরে বলে গেলাম।

আমার দুঃখজনক জীবন বড় বেদনাবিদীর্ণ। গলা দিয়ে অনেক কথা বেরুতেই চায়নি। তবুও ধরা গলায় অনর্গল সব কথা বললাম।

আমার হৃদয়-বিদারক জীবন-ইতিহাস শুনে সেক্রেটারীবাবুর চোখগুলোও ছলছল করতে লাগলো। তিনি বোধ হয় অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তাই দেখলাম তিনি উঠে গিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এলেন। তখন তাঁর চোখগুলো ফোলা-ফোলা।

সেক্রেটারীবাবু গম্ভীর গলায় হাঁক দিয়ে গিন্নীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কইগো শুনছ, মাষ্টারবাবু আমাদের এখানে খাবেন।'

তিনি আমাকে বললেন, 'দশটা পর্যন্ত স্কুল, তাই আজতো কাউকে আর স্কুলে পাওয়া যাবে না। কাল স্কুলে গিয়ে ছাত্র-মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব।'

ভৃত্যকে ডেকে সেক্রেটারীবাবু বলেন, 'যাও তো বাপু, হেডমাস্টারবাবুর বাড়ি যাও। ওঁকে বলবে উনি যেন বিকেল বেলায় আমার বাড়ি আসেন। আর শোন, তাঁকে বলবে একজন নতুন মাস্টারমশায় এসেছেন।'

একটু থেমে সেক্রেটারীবাবু আমায় জিজ্ঞেস করেন, 'কোথায় থাকবেন?'

উত্তর দিলাম, 'আপনি ঠিক করে দিন।'

'জায়গির থাকবেন?'

'ছেলে-মেয়ে পড়িয়ে থাকবার কথা তো বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'না। জায়গির থাকবো না। স্কুলের কাজকর্ম সেরে অবসর সময়ে একটু পড়াশোনা করার ইচ্ছে আছে। প্রি ইউনিভারসিটি, বি-এ পাশ করে জীবনে একটু প্রতিষ্ঠিত হতে চাই।'

'বেশ ভালো—খুব ভালো। তাহলে স্বাধীন ভাবে থাকতে চান?'

'হাঁ, তাই। আমি আগরতলা থেকে আসতে ডেক, কড়াই, থালা-বাসন ইত্যাদি কিনে এনেছি।'

'তাহলে আপনার একটা ঘর চাই।'

'হাঁ। খোলা-মেলা জায়গায় একটা ছোট্ট ঘর। আর একজন বিশ্বস্ত লোক, যে রান্না বান্না করে দিয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। বিকেল বেলায় হেডমাস্টার বাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অতি সত্বর আপনার সব ব্যবস্থা করে দেব।'

হঠাৎ ভগবানবাবু বলে ওঠেন, 'বেশ বেলা হয়ে গেছে। চলুন চান-টান সেরে খেয়ে দেয়ে নেই।'

বেলা অপরাহ্ন।

হেডমাস্টার মশায় এসে গেছেন। সেক্রেটারীবাবু ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর যে যার আসনে বসলাম।

সেক্রেটারীবাবু হেডমাস্টার মশায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমরা কাল সকালে আপনার স্কুলে যাব। ওই সময়ে নতুন মাস্টারবাবুর সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেব।'

'বেশ, তাই হবে।'

সেক্রেটারীবাবু হেডমাস্টার মশায়কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনাদের নতুন মাস্টার মশায়ের জন্য আলাদা একটা বাসা চাই। উনি পড়াশোনা করতে চান। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে কোয়ালিফিকেশন বাড়াবেন। তাহলে বলুন, কোথায় একটা ভালো ঘর পাওয়া যায়। ঘরটি যেন হয় একটু খোলা মেলা আর নীরব নির্জন হয়।'

হেডমাস্টারবাবু স্থানীয় লোক। ওঁর বাড়ি ঝালাছড়া। তাঁর নাম

রবীন্দ্রনারায়ণ কারবারি। বয়েস প্রায় চল্লিশ বছর। বেশ মোটা-সোটা চেহারা। পরিচ্ছন্ন—সুদর্শন তিনি। গুরুগম্ভীর ভদ্রলোক।

হেডমাস্টারবাবু কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, 'ডেভাছড়ার মন্ত্যা চাকমার একটা ঘর আছে। ওটাতে আগে চাকমাদের ক্যাং (মন্দির) ছিল। গাঁয়ের লোকেরা এখান থেকে বুদ্ধমূর্তি সরিয়ে নিয়েছে। এটা এখন খালি। একটু দূরে আছে একটা ছোট্ট কুয়ো। জায়গাটা খুব নির্জন। পড়াশোনার জন্যে বেশ ভালই হবে।'

'বুঝেছি কোন জায়গাটি। ক্যাংটিও দেখেছি। কিন্তু ঘরটা বোধ হয় মেরামত করতে হবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন স্যার। তারা গরীব, তাই আগাম কিছু চাইবে বোধ হয়।'

'তা আমিই দিয়ে দেব। মাস্টারবাবু মাসে মাসে ভাড়াটা আমায় দিয়ে দিলেই চলবে। তাহলে থাকার ঘর ঠিক হয়ে গেল। কি বলেন মাস্টার বাবু?'

আমি খুশি হয়ে ওঁদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলাম।

এবার সেক্রেটারীবাবু হেডমাস্টারমশায়কে বললেন, 'তিনি তো নিজে রান্না করতে পারবেন না। একজন রাঁধুনি ঠিক করে দিন।' তারপর আমাকে বলেন, 'এখানে বামুন পাবেন না। এখানে সবাই চাকমা।'

বললাম, 'আমার কোন জাত বিচার নেই। পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন হলেই যে কোন লোকের হাতে রান্না খেতে পারি।'

'তা হলেতো অসুবিধা চুকেই গেল।' তারপর হেডমাস্টার বাবুকে বলেন, 'তাহলে মাষ্টারবাবুর জন্যে একজন ভাল স্বভাব চরিত্রের রাঁধুনি ঠিক করে দিন।'

হেডমাস্টারবাবু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, পেয়ে গেছি। ডেভাছড়ার ছোইচাং চাকমার একটি মিলাপুয়ো (মেয়ে) আছে। বয়েস বার-তের হবে। মাস্টারবাবু যে বাড়িতে থাকবেন তার কাছেই ওদের নিজস্ব বাড়ি। তারা খুবই গরীব। মাস্টারবাবু মাসে মাসে

কিছু দিলে এদের সাহায্য হবে। রান্না-বান্না করে দিনের বেলায় ও নিজেই বাড়ি যেতে পারবে। রাতে মাস্টারবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে ছোইচাং চাকমা এসে ওর মেয়েকে নিয়ে গেলেই চলবে।'

'খুব ভাল প্রস্তাব। আপনি আলাপ-আলোচনা করে আগামীকালই আমাকে জানাবেন।'

সেক্রেটারীবাবু আমাকে বলেন, 'মাস্টারবাবু, আপনি খুব ভাগ্যবান। সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল। আপনি যেরূপ স্বাধীনভাবে থাকতে চান ঠিক ওরূপই পেয়ে গেলেন। ডেভাছড়া গ্রামের লোকগুলোও খুব নম্র এবং শান্ত। তাদের সঙ্গে যদি মিলেমিশে থাকেন তবে তারা আপনাকে দেবতার মতন ভক্তি করবে।'

ওঁদের অভয় দিয়ে বললাম, 'আমার দিক থেকে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাদের যাতে কোন অখ্যাতি না হয় ওদিকে আমার সজাগদৃষ্টি থাকবে।'

হেডমাস্টারবাবু সেক্রেটারী মশায়কে বললেন, 'আজ তাহলে উঠি স্যার। কাল সকালে তো স্কুলে আসছেন তখন আরও আলাপ হবে।'

সেক্রেটারীবাবু হেডমাস্টার মশায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'আপনি যাবার সময় মন্যা চাকমার ঘরটা আর রাঁধুনির জন্যে ছোইচাং চাকমার মেয়েটি সম্পর্কে আলাপ করে যাবেন। কাল সকালেই কিন্তু আমাকে ফাইনাল খবর দেবেন। আচ্ছা, তাহলে আসুন।'

'তাই হবে স্যার।' বলে, হেডমাস্টারবাবু অভিবাদন করে চলে গেলেন।

স্থির হলো আমার বাসা ঠিক না হওয়া অবধি আমি সেক্রেটারীবাবুর বাড়িতেই থাকব।

হেডমাস্টারবাবু চলে যাবার পর সেক্রেটারী আমাকে নিয়ে ছামনু গ্রামটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখালেন। পথে যার সঙ্গে দেখা হলো আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এভাবে ঘণ্টা দুই ঘুরে ঘুরে রাত আটটায় আমরা সেক্রেটারীবাবুর বাড়ি ফিরে এলাম।

॥ চার ॥

ছামনু জুনিয়র বেসিক স্কুল।

স্কুলটি ছামনু বাজার থেকে দু'শ মিটার দূরে।

মালিধর, রাজধর, ভাইবোনছড়া, ক্ষেত্রিছড়া, ঝালাছড়া, ডেভাছড়া, মাণিকপুর, ছামনু গ্রাম থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এ স্কুলে পড়তে আসে।

স্কুলটিতে পাঁচটি শ্রেণী। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত।

বর্তমানে স্কুলে প্রধান শিক্ষক এবং দুইজন সহ-শিক্ষক আছেন।

স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রায় দুশ। তিনখানা ঘর। উপরে ছনের ছাউনি। পাশে ছোট্ট একটি ঘর। ওটা হলো হেডমাস্টার মশায়ের চেম্বার।

আজ স্কুল সরগরম। সেক্রেটারীবাবু স্কুল পরিদর্শনে আসবেন। সঙ্গে থাকবেন নতুন একজন শিক্ষক।

ছিমছাম স্কুল প্রাঙ্গণ। গোছ-গাছ করা হয়েছে স্কুলের ঘরগুলো। খুব ভোরে হেডমাস্টারবাবু স্কুলে এসেই স্কুলসংলগ্ন ছাত্র-ছাত্রীদের ডেকে স্কুলটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়েছেন।

বেলা আটটা।

আমাকে নিয়ে সেক্রেটারী ভগবানচন্দ্র দেওয়ান মশায় স্কুলে ঢুকলেন।

নীরব নিস্তব্ধ স্কুলটি।

ছাত্র-ছাত্রীরা চুপচাপ। যার যার ক্লাসে বসে আছে তারা। মাস্টার মশায়েরা বেত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যাতে কেউ গণ্ডগোল না করে।

হেডমাস্টারবাবু এগিয়ে এসে সেক্রেটারীবাবু এবং আমাকে স্বাগত জানালেন।

স্কুলে ঢুকে সেক্রেটারীবাবু প্রধান শিক্ষক মশায়কে বলেন, 'দয়াকরে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বাইরে এনে লাইন করে দাঁড় করিয়ে

দিন। আমি ওদের কাছে কিছু বলবো, আর নতুন শিক্ষক মশায়কেও তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

তখন হেডমাস্টারবাবু বলেন, 'ভালই হবে। আমি তাই করিয়ে নিচ্ছি।'

ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে রাখা হলো একটি টেবিল আর পাঁচটি চেয়ার।

ছাত্র-ছাত্রীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। টুশব্দটি নেই।

শীতকাল। রোদ পড়েছে স্কুল প্রাঙ্গণে। শীতের সকালের রোদের মধুর আমেজ ছেলে-মেয়েদের দেহ স্পর্শ করছে স্নিগ্ধ মমতার মতন।

সেক্রেটারীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন. শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়, উপস্থিত শিক্ষক মণ্ডলী এবং প্রাণের ছাত্র-ছাত্রীরা, আজ তোমাদের একটা সুখবর দিচ্ছি, বহুদিন দরবারের পর তোমরা একজন নতুন শিক্ষক পেয়েছে।'

সেক্রেটারীবাবু আমাকে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গেপরিচয় করিয়ে দিলেন।

'আমি নতুন মাস্টারবাবুর সঙ্গে কাল সারাদন ধরে আলাপ করেছি। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন, আমরা যদি ওঁকে না তাড়াই উনি কোনোদিন আমাদের ছেড়ে যাবেন না। এই শিক্ষক মশায়কে পাবার জন্যে তোমরা তোমাদের ভাগ্যবান ভাবতে পারো। তিনি আমাকে আরও কথা দিয়েছেন স্কুলটিকে এবং তোমাদের সকলকে ভাল করে গড়ে তুলবার জন্যে তিনি ওঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন। আমি চাই আদিবাসীদের এই স্কুলটা আরও বড় হোক্, সুন্দর হোক। আমি আরও চাই এই অঞ্চলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আরও বেশী সংখ্যায় স্কুলে আসুক। লেখাপড়ার প্রতি আরও তাদের ঝোঁক বাড়ুক। আর মাস্টারমশায়দের উদ্দেশ্যে আবেদন রাখছি ওঁরা যেন স্কুলের নিয়ম কানুন ঠিক-ঠাক মতো মেনে চলেন।

আজ আমি আর বেশী কথা বলবো না। তথাগত বুদ্ধের কাছে তোমাদের সকলের এবং শিক্ষক মশায়দের মঙ্গল কামনা করে আমি আমার ভাষণ শেষ করছি।'

সবাই করতালি ধ্বনি করে সেক্রেটারীবাবুর কথায় স্বাগত জানালেন।

সেক্রেটারীবাবু আমাকে কিছু বলবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলাম, 'শ্রদ্ধাস্পদ সেক্রেটারী মহোদয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়, ভ্রাতৃপ্রতিম শিক্ষক মশায়েরা এবং আমার প্রাণের ছোট ভাই ও বোনেরা, তোমরা খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছো, রোদের মধুর আমেজ এখন আর নেই। রোদে তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। তাই আজ আমি বেশী কিছু বলবো না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি এই স্কুলের আর এই অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ব্যাপারে আরও যেন উৎসাহ বাড়াতে পারি তার জন্য আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োজিত করবো। আমি আরও শপথ করছি, আসল মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবই।

সবার শেষে ছাত্র ছাত্রীদের প্রাণ ভরা আশীর্বাদ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।'

সেক্রেটারীবাবু প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য মাস্টার মশায়দের কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। ওঁরা সকলেই বক্তৃতার শেষে প্রতিজ্ঞা করলেন বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে স্কুলের মঙ্গলের জন্য কাজ করে যাবেন।

সেক্রেটারীবাবু প্রধান শিক্ষক মশায়কে ফিসফিস গলায় বলেন, 'আজ ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দিন। আমরা কিছু দরকারী কাজ-কর্ম করবো।'

হেডমাস্টারবাবু দাঁড়িয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্য বলেন, 'শোন. স্কুলের সেক্রেটারী মশায়ের সম্মানার্থে আজ তোমাদের ছুটি ঘোষণা করলাম।'

দপ্তরী ঘণ্টা বাজিয়ে দিলো।

ছেলে-মেয়েরা এবার কে কার কথা শোনে! হৈ-হৈ রৈ-রৈ করতে করতে যে যার বাড়ির দিকে চলে গেল।

সেক্রেটারীবাবু হেডমাস্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে নতুন

মাস্টার মশায় বিমলবাবুর থাকা-খাওয়ার জন্যে যে ব্যবস্থার কথা বলেছিলাম, তার কি করেছেন ?

'ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে স্যার। ওরা এসেছে।'

'ডাকুন তাদের।'

মন্যা চাকমা এগিয়ে এলো। ও বললো, 'প্রণাম সেক্রেটারীবাবু।'

সেক্রেটারীবাবু বললেন, 'প্রণাম। শুন, উনি হলেন আমাদের নতুন মাস্টার মশায়। তিনি খুব সজ্জন ব্যক্তি। ওঁর জন্যই তোমার ঘরটা চেয়েছি। ঘরটা মেরামত করতে কত টাকা লাগবে ?'

'লোকের মজুরী লাগবে বাহাত্তর টাকা। আর লাগবে আট টাকার জিনিসপত্র। ছন-বাঁশের কোন টাকা লাগবে না। ওগুলো আমরা এমনিতেই মোন (পাহাড়) থেকে কেটে নিয়ে আসব।'

'তাহলে মোট আশী টাকা লাগবে তো ?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'এই নাও আশী টাকা। চারদিনে কাজ শেষ চাই। আর শোন, ভাড়া কিন্তু পাবে মাসে পনের টাকা।'

'তাই হবে স্যার।'

অভিবাদন করে মন্যা চাকমা চলে গেল

এবার ছোইচাং চাকমা এগিয়ে এল। বললো ও, 'পরনাম সেক্রেটারীবাবু।'

সেক্রেটারীবাবু বলেন, 'পরনাম নয়, প্রণাম বলতে হয়। তোমার মেয়ে পারবে তো রান্না-বান্না করতে ?'

'পারবে বাবু। কিছুদিন ওর মা দেখিয়ে দিলে ও ঠিক পারবে।'

'যাক্, আমি কিছু জানি না। তোমার বউ আর মেয়ের উপর থাকলো মাস্টার বাবুর খাওয়া দাওয়ার ভার। দেখো যেন কোন অসুবিধে না হয়।' কৌতুক মিশ্রিত স্বরে বললো সেক্রেটারীবাবু। তারপর তিনি ছোইচাং চাকমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার মেয়েকে মাসে কত টাকা দিতে হবে ?'

ছোইচাং চাকমা দরবিগলিত স্বরে বললো, আমরা গরীব

পাহাড়ী স্যার। আপনারা যা দয়া করে দেবেন তাই আমরা মাথা পেতে নেব।'

আমাকে উদ্দেশ্য করে সেক্রেটারীবাবু বলেন, 'কতটাকা দেবেন বিমলবাবু?'

বললাম, 'আমি দুই বেলা ওঁর মেয়েকে খাবার দেব। মেয়ের কাপড়-চোপড়ও দেব। আর বেতন আপনারা যা বলে দেবেন তাই দেব।'

সেক্রেটারীবাবু বলেন, 'বেতন মাসে সাত টাকা করে পাবে। খুশিতো?'

ছোইচাং চাকমা বলে, 'আমি সন্তুষ্ট বাবু।'

সেক্রেটারীবাবু বলেন, 'আচ্ছা। তাহলে তাই ঠিক হলো। তাহলে এস।'

প্রণাম করে ছোইচাং চাকমাও চলে গেল।

সবাইকে স্কুল সম্পর্কে কিছুক্ষণ এটা ওটা বলে সেক্রেটারীবাবু আমাকে নিয়ে চলে গেলেন ওঁর বাড়ি।

॥ পাঁচ ॥

ছয়দিন পরের কথা :

গত কয়েকদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া করছি সেক্রেটারী বাবুর বাড়ি। স্কুলের কাজ-কর্মও যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছি।

নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ানো এবং পড়াবার কায়দা দেখে হেডমাস্টার মশায় ভারী খুশ। ছাত্র ছাত্রীরাও খুব সন্তুষ্ট

ডেভাছড়ায় যে বাড়িতে আমার থাকার কথা ওই বাড়িটি ভগবান-বাবুর তদারকিতে ছোইচাং চাকমা, ওর বউ আর তার মেয়ে মিলে-মিশে ঘরটি সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়েছে। টেবিল, চেয়ার, চৌকি আর আগরতলা

থেকে আমার আনা সব জিনিসপত্র দিয়ে বেশ গোছ-গাছ করা হয়েছে ঘরটি। একটা পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন সেক্রেটারীবাবু।

স্কুলের কাজ সেরে আমি যখন আমার ডেরাতে পৌঁছলাম, ভগবান-বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'আসুন। দেখুন আপনার ঘর-দোর বেশ ফিটফাট করে দিলাম। দু'তিন দিনের বাজারও করে দিয়েছি। তারপর থেকে নিজেই শুরু করে দেবেন।'

সব দেখেশুনে বিস্মিত হয়ে গেলাম। কৃতার্থ হয়ে সবিনয়ে বললাম, 'আমার জন্যে এত করছেন ?'

'কি-ই বা করলাম। আপনি নতুন লোক, তার উপর গরবা (অতিথি)। এটা তো আমাদের কর্তব্য।'

উত্তরের জন্য আর কোন ভাষা তাড়াতাড়ি খুঁজে পেলাম না।

ছোইচাং চাকমার মেয়েকে উদ্দেশ্য করে সেক্রেটারী বাবু বলেন, 'ওই মেয়ে, মার কাছ থেকে সব কাজকর্ম শিখে নে। তারপর একটু থেমে সরোষে বলেন, 'যদি তোর মনিব তোর কাজে সন্তুষ্ট না হয় তবে তোর মা-বাবাকে তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে কিন্তু।'

সেক্রেটারীবাবুর কথায় মেয়েটি খুব সঙ্কোচ অনুভব করে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেক্রেটারীবাবু তড়াং করে উঠে দাঁড়িয়ে গটগট করে ডেরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ওঁর যাবার পথে কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম ওঁর অমায়িক ব্যবহারের কথা।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এলো। দেখলাম ছোইচাং চাকমা, তার বউ আর মেয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

মেয়েটির দিকে এবার ভাল করে দেখলাম। ওর গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। টানা-টানা চোখ, সুডৌল মুখ, রাজহাসের মতন গলা, মিষ্টি চেহারা আর চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ।

তাড়াতাড়ি ওদের বললাম, 'এবার বলুনতো ছোইচাং চাকমা বাবু, আপনার মেয়ের নাম কি ?'

দ্রুত ছোইচাং চাকমা উত্তর দিলো, 'আমায় বাবু বলবেন না মাস্টার মশায়। আমাকে ছোইচাং বলেই ডাকবেন।'

'আচ্ছা তাই হবে। এবার বলতো তোমার মেয়ের নাম কি?'

'ওর নাম, কাতু চাকমা। ওকে আমরা কাতু বলেই ডাকি।'

আমি মনে মনে ভাবলাম ওর নাম কাতু চাকমা। হয়তো কাত্যায়নীর অপভ্রংশ হবে ওর নামটা। তার ওই অপভ্রংশ নামটাই জন্মের পর থেকে ব্যবহার করে আসছে ওরা। ভাল নাম কেউই দেয়নি।

আমি ওদের উদ্দেশে বললাম, 'শোন, কাতু নামটা ভাল নয়। তাছাড়া ওই নামের কোন অর্থ হয় না। আমি ওকে 'গোমতী' বলেই ডাকব। কেমন হলো নামটা?'

ছোইচাং চাকমার বউ বললো, 'আমরা মুখ্য সুখ্য মানুষ। অতসব বুঝি না। আপনার যদি ভাল লাগে আজ থেকে আমরা ওই নামেই ওকে ডাকব।'

'এবার বলহে ছোইচাং চাকমা, স্নান কোথায় করবো?'

'জল এনে রেখে দিয়েছি। কুয়ো বেশী দূরে নয়। গোমতী প্রতিদিন আপনার জন্যে জল উঠিয়ে রাখবে। সেক্রেটারীবাবু আপনার জন্যে চানের জল রাখার একটি পাত্র এনে দিয়েছেন।'

'এতো করেছেন!' আমি বিস্ময়ে হতবাক হলাম।

শিগগির চান সেরে খেয়ে-দেয়ে নিলাম।

কিছুক্ষণ পর তারা সবাই বিদাই নিল। যাবার সময় ছোইচাং চাকমা বলে গেল, 'বিকেলে গোমতী আর ওর মা এসে আপনার সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

'আচ্ছা—আচ্ছা' বলে আমি শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে শুয়ে নতুন জীবনের কথা ভাবছি। কিভাবে স্কুলে কাজ করা যায়, কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার প্রতি উৎসাহ জাগানো যায়, ভাবতে লাগলাম। আগামীকাল ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি-বাড় গিয়ে ওদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নেব। শুধু

ভেভাছড়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকলে চলবে না। হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে আলাপ করে ক্ষেত্রিছড়া ও ছামনু গ্রামের অভিভাবকদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া নিয়ে আলোচনা করতে হবে। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঠুং-ঠাং শব্দে জেগে উঠলাম। জেগে উঠে দেখি গোমতী আর ওর মা ঘর ঝাড়-পোছ করছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম।

বাইরে এসে দেখি আকাশে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবুডুবু।

অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। খুব লজ্জা পেয়ে গেলাম। দেখলাম মা—বেটী জল তুলে সব ঠিক-ঠাক করে নিয়েছে।

গোমতীর মা আমায় জিজ্ঞেস করছে, 'মাস্টারবাবু, চা খাবেন?'

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। বললাম, 'এ অজ পাড়াগাঁয়ে চা কোথা পাবে? এখানে তো কোন দোকান-টোকান নেই!'

'কেন, দেওয়ান বাবু কিছু চা, চিনি এবং ছোট একটিন মুড়ি কিনে দিয়েছেন। আর দুধের জন্য বলে গেছেন আমাদের গাঁয়ের লম্বাছিরা চাকমাকে ও প্রতিদিন এক লিটার করে দুধ দিয়ে যাবে! আজ এই মাত্র দুধ দিয়ে গেছে ও দুধ টুকু জ্বাল দিয়েছি।'

আমি বড় ভাগ্যবান। চৌদ্দ দেবতাকে আবার প্রণতি জানালাম। খুশির আবেগে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'করো একটু চা। আর শোন, তোমাদের মা-বেটীর জন্যও চা করে নিও কিন্তু।'

গোমতীর মা সলজ্জ হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গোমতী আমাকে চা এনে দিল। তৃপ্তি সহকারে চা পান করলাম।

গোমতীর মা আমায় জিজ্ঞেস করে, 'মাস্টারবাবু, রান্না চাপিয়ে দেব?'

'তাই করো, আমি একটু ঘুরে আসি।'

'রাত-বেরাতে বেশী দূর যাবেন না মাস্টারবাবু।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'জন্তু জানোয়ারের ভয় আছে।'

'তাই নাকি।'

'মাস তিনেক আগে আমাদের গাঁ ছেড়ে, দুটো গাঁ পেরিয়ে মালিধর গ্রাম থেকে বাঘে একটা গরু নিয়ে গেছে। এছাড়া রাতে সাপ-খোপের ভয়ও আছে।'

'তোমাদের গ্রামে বাঘ এসেছিল কখনও সখনও?'

'অনেক আগে এক বিরাট বাঘ এসে বড় উপদ্রব করেছিল।'

'আর কোন জন্তু-জানোয়ার আসে?'

'জুমের ফসল খেতে হাতি তো হামেশাই আসে।'

'তাহলে তো রাত বেরাতে বাইরে যাওয়া বড়ই বিপদের কথা।'

ওদের কথা শুনে আমি আর ওই রাতে বাড়ির বাইরে যাইনি।

মা-বেটী রান্না-বান্না করে আমাকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে ওরা চলে গেল।

যাবার সময় গোমতীর মা বলে গেল, 'মাস্টারবাবু, ভয় করবেন না। এই লুধিকটা (লাঠিটা) রইলো। কাল একটা যাধি (বর্শা) এনে দেব। যদি রাতে কোন কিছু আসে তবে চিৎকার করলেই আমরা সবাই দৌড়ে আসব।'

ওরা চলে গেলে আমি গেটের এবং ঘরের দরজায় ভাল করে খিল লাগিয়ে দিলাম। হারিকেনটাতো জ্বালানই ছিলো। দেশলাইটা ভাল করে দেখে নিলাম। লাঠিটা কাছে রাখলাম।

চৌদ্দ দেবতার নাম করে শুয়ে পড়েছি। এলোমেলো চিন্তা করতে করতে এক সময় ঘুম এসে গেল।

বাইরের গেটের ধাক্কা ধাক্কিতে সকাল বেলায় ঘুম ভাঙল।

চোখ রগড়াতে-রগড়াতে গেট খুলে দেখি মা-বেটী বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরে এসে গোমতীর মা ঘর দোর ঝাট দিতে শুরু করে, আর গোমতী কুয়ো থেকে জল আনছে।

আমি প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে চেয়ারে এসে বসলে গোমতী চা-মুড়ি এনে দিলো।

প্রাতঃভোজন সেরে দুর্গা-দুর্গা বলে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তাদের বলে গেলাম, 'স্কুলে যাচ্ছি।'

যথারীতি স্কুলের কাজ সেরে ডেরাতে ফিরতে প্রায় বারোটা বেজে গেছে।

স্কুল ছুটির পর হেডমাস্টারবাবু সব মাস্টার মশায়দের সঙ্গে স্কুলের নানান সমস্যা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন তাই অতটা দেরী।

ঘরে ঢুকে দেখি গোমতী সব কাজ সেরে শুয়ে চুপচাপ বসে আছে। একটু পর ওর মা হন্তদন্ত হয়ে ডেরাতে ঢুকলো।

আমাকে খাইয়ে-দাইয়ে মা-মেয়ে চলে গেল।

এভাবে পনের-ষোল দিন পর দেখি গোমতীর মা আর আসছে না না আসার কারণ জিজ্ঞেস করাতে গোমতী হেসে হেসে উত্তর দিলো, 'আমি কাজ-কর্মে পাকা হয়ে গেছি মাস্টার বাবু।'

ইতিমধ্যে গোমতীও অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। এখন ও আর আগের মতন আমাকে কিছু দিতে বা আমার সঙ্গে এটা-ওটা নিয়ে কথা বলতে লজ্জা পায় না। যদিও লজ্জাই নারীর ভূষণ।

এদিকে আমিও গ্রামের পাহাড়ীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচিত হয়ে গেছি। ওদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছি।

প্রায় এক মাস পর ডেভাছড়া গ্রামের সবার সঙ্গে মিশে গেছি। মেয়ে-পুরুষ সবাই আমাকে চেনে। আমিও ওদের সবাইকে জেনে গেছি। আমি যেন তাদের কাছে কতো আপনার জন। সবাই আমাকে মাস্টারবাবু বলে।

প্রথম প্রথম অনেকে সুগুরিগুলো (লাউ), কুমুড়ো (কুমোড়) ইত্যাদি, আবার কেউ কেউ বদা (ডিম), কুরা (মোরগ) দিয়েছে। আমি বারণ করিনি। কিন্তু পরে যারা গরীব পাহাড়ী তাদের কোন জিনিস যেন গোমতী না নেয় এর জন্য ওকে কড়া নির্দেশ দিয়েছি।

॥ ছয় ॥

তিনমাস পরের কথা।

ভাইবোনছড়ায় কয়েকটা বাড়িতে গিয়েছিলাম। ওদের ছেলে-মেয়েরা কেউ কেউ গত কয়েকদিন ধরে স্কুলে যাচ্ছে না। ঘুরে-ঘুরে ওদের মা-বাবার কাছে তাদের না যাবার কারণ জানতে চাইলাম। কেউ বললেন মায়ের অসুখ, তাই মেয়েটিকে রান্না-বান্নার কাজ করতে হচ্ছে। কেউ বললো ছেলেটি তার বাবার সঙ্গে ক্ষেতে গিয়েছিল, আবার কেউ বললো তাদের ছেলেরা স্কুলের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, কেন স্কুলে যায়নি জানে না ইত্যাদি। অভিভাবকদের বলে এলাম খুব জরুরী দরকার না হলে কেউ যেন স্কুল কামাই না করে।

যে ছেলেগুলো ইচ্ছে করেই স্কুলে গরহাজির ছিল তাদের নাম টুকে নিয়ে এলাম।

সব অভিভাবকদের বলে এলাম লেখাপড়ার একটা বিশেষ দরকার আছে; আর যারা অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা করতে পারে না তাদেরও যে সাধারণ লেখাপড়ার প্রয়োজন আছে ওই সম্পর্কে সব পাহাড়ীদের বুঝিয়ে-শুঝিয়ে এলাম।

ভাইবোনছড়া থেকে বেরিয়ে ওই গায়ের পাশ দিয়ে যে সর্পিল পথটি ঝোপ ঝাড়, জঙ্গল-জাবড়ায় পরিপূর্ণ টিলার দিকে চলে গেছে ঐ পথ ধরে প্রায় মাইল দুয়েক এগিয়ে গেলাম।

আকাশ বিবর্ণ। দূরের টিলার চূড়া আবছা হয়ে আসছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য এখন স্থির। বিধুর লালিমায় ভরে গেছে চারদিক। একটু পরেই সূর্য হারিয়ে যাবে পশ্চিমের ঢালে।

হঠাৎ মোরাঙ চাকমার সঙ্গে দেখা। ও জঙ্গলের আঁকাবাঁকা পথ

বেয়ে আমার দিকে আসছে। ওর মাথায় এক বোঝা কাঠ। ও বললো, 'কোথায় যাচ্ছেন মাস্টারবাবু?'

বললাম, 'কোথায়ও না। এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে একটু দেখছি।

আপনার জন্য সকালে একটা ছরমা (মুরগি) এনেছিলাম। গোমতী বললো মাস্টার বাবু ছরমা রাখতে বলে যায়নি। তাই ও রাখতে পারবে না।

'ভালই হয়েছে। ছৈলেংটা থেকে আমার যে অতিথি আসার কথা ছিল, তিনি এখন আসবেন না। ওটা তুমি পরশু ছামনু হাটে বিক্রি করে দিও। ভালো দাম পাবে। আমাকে তো কম দরে দিতে।'

'আপনার কথা আলাদা। আপনি যে এ গাঁয়ের দেবেদা (দেবতা)। আপনি আসাতে এ গাঁয়ের ছেলে-মেয়েরা একটু লেখাপড়া শিখছে। আপনাকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।'

তারপর ও ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বললো, 'আর এগোবেন না মাস্টার বাবু। বাঘের ভয় আছে। পা চালিয়ে চলুন। অন্ধকার হয়ে এলো যে।'

এই ঝোপ-জঙ্গল-টিলায় তাড়াতাড়ি আসা শীতের সন্ধ্যাকে একটা অশ্লীল গালাগাল দিতে-দিতে মোরাঙ চাকমা এগিয়ে চলে।

তার কথা শুনে আমিও ওর পিছু-পিছু ওর মতন সমান গতিতে এগিয়ে চললাম।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর ও ডানদিকের পথ ধরে তার গাঁয়ের দিকে ছুটে চললো। আমিও আমার গ্রামের দিকে এগোলাম।

ডেরাতে ফিরে দেখি গোমতী একলাটি বসে আছে। আনমনে কি জানি ভাবছে ও।

গোমতী আমার কাছে এখন পুরোপুরি সহজ-সরল-স্বাভাবিক। লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে আর নেই। তাই সহজ গলায় গোমতীকে বললাম, 'খুব খিদে পেয়েছেরে। কিছু খেতে দে গোমতী।'

'দেওয়ান বাড়িতে আজ বুদ্ধের পূজো হয়েছে, ভগবানবাবু পূজোর প্রসাদ পাঠিয়েছেন। তাই দেবো?'

'বেশ – বেশ। তাই দে।'

হাত-মুখ ধুয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই থালায় করে প্রসাদ নিয়ে এলো ও।

মনোযোগ সহকারে খাচ্ছি। এমনসময় গোমতী বললো, 'এরসঙ্গে কিছু চিড়ে দেব?'

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বললাম, 'না—না। আরও কিছু খেলে খিদে নষ্ট হয়ে যাবে। রাতে একদম খেতে পারবো না।'

কিছুক্ষণ পর ও চা দিয়ে গেল।

মাঘ মাস।

শীতের রাত। শীতের হিমেল হাওয়া বইছে চারদিকে। হিমার্ত বাতাস মাঝে মধ্যে সাঁ-সাঁ করে আছড়ে পড়ছে। মনে হয় যেন বরফের কণা ঝড়ছে আকাশ থেকে।

সামনে প্রিইউনিভারসিটি পরীক্ষা। মোটামুটি তৈরী হয়েছি। অতি মনোনিবেশ সহকারে পাঠগুলো আবার দেখে নিচ্ছি। আর এদিকে গোমতী রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে ও সব কাজ সেরে নিয়েছে।

এমন সময় বাইরে গোমতীর বাবা ছোইচাং চাকমার গলা শোনা গেল।

ছোইচাং চাকমা গলা খাঁখারি দিয়ে বললো, 'এসে গেছিরে গোমতী।'

গোমতী বললো, 'তুমি একটু অপেক্ষা করো বাবা। মাস্টারবাবুর এখনও খাওয়া হয় নি।'

আমি ছোইচাং চাকমাকে বললাম, 'ভিতরে এসে বসো। ওখানে আগুনের পাতিলটা আছে। তুষগুলো একটু নাড়াচাড়া দিয়ে নাও।'

ছোইচাং চাকমা ঘরে ঢুকলো। হাতের বর্শাটা একদিকে রেখে আগুনের পাতিলটা নিয়ে বসে ও। হাত-পা একটু চাঙ্গা করে নিচ্ছে। ওইগুলো যেন বরফ হয়ে গেছে।

গোমতীকে ডেকে বললাম, 'তোর বাবা বসে আছে। তাড়াতাড়ি খেতে দে।'

আমি লাগোয়া রান্নাঘরে ঢুকে খেতে বসলাম।

খেতে-খেতে ছোইচাং চাকমার সঙ্গে কথা বলছি। নানান স্থানের জিনিসের দর জিজ্ঞেস করছি ওকে। ময়নামা চাউলের কেজি কত? ছামনুতে মাছ-টাছ আজ এসেছে কিনা?

ওকে আরও জিজ্ঞেস করলাম আজ কোন কাজ পেয়েছে কিনা? বউ এর শরীর আজ কিরকম?

যন্ত্র চালিতের মতো ও আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্নগুলোর উত্তর দিচ্ছে সত্য কিন্তু সব এলোমেলো। তাই বুঝলাম ছোইচাং চাকমা ঝিমোচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে আমি বিছানায় এসে বসলাম। দেখলাম গোমতীর বাপ পাতিলে আগুন পোহাচ্ছে আর মাঝে মধ্যে মাথাটা পাতিলে ঠেকছে।

আর ওদিকে গোমতী একটি থালায় ওর খাবার গুছিয়ে নেয়। ডানহাতে থালাটা তুলে ধরে আর বাঁ হাতে কেরোসিনের চেরাগ (কুপিটা) ধরে নিয়ে আমাকে বলে, 'চলি মাস্টারবাবু।'

বললাম, 'এসো।'

গোমতী চলে যাচ্ছে, এমন সময় ওকে বললাম, 'গোমতী, সকাল সকাল এসে আমাকে ডাকবি কিন্তু। সামনে পরীক্ষা। আমি একদম ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারি না।'

'আচ্ছা' বলে গোমতী বাবাকে বললো, 'চলো বাবা।'

গা ঝেড়ে ঝুড়ে ছোইচাং চাকমা উঠে দাঁড়াল। তারপর আমাকে বললো, 'প্রণাম মাস্টারবাবু।'

বললাম, 'প্রণাম।'

বাপ-বেটী চলে গেল।

ওদের চলে যাবার পর ভাবি গোমতী যেটুকু খাবার নিয়ে যাচ্ছে তা দিয়ে ওরা তিনজনে ভাগ করে খাবে। ছোইচাং চাকমা বুড়ো

হয়ে গেছে তাই সব সময় কাজ পায় না। ওর বউ মাঝে-মধ্যে এ বাড়ি ওবাড়িতে কিছু কিছু কাজ করে। কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে গোমতীর মাও অসুস্থ।

তাই গোমতীকে আমি যে খাবার দেই হয়তো বা প্রায়ই গোমতীর পেট ভরে না। ওরা সবসময় এ বেলা অথবা ও বেলায় যা খায় তা না খাওয়ারই মতো। উপোসে উপোসে গোমতীর মা অস্থিচর্মসার হয়ে গেছে। একারণে বিছানায় আশ্রয় নিতে হয় প্রায়ই।

কিন্তু আমার এত অর্থ নেই যে ওদের তিনজনকে সারা বছর খাওয়াই। যদি তাদের খাওয়াবার মতো অর্থ থাকতো তবে আমার মতন খুশি আর কেউ বোধ হয় হতো না।

তাই দুবেলা খাওয়ার পরই রোজ ওদের কথা মনে পড়ে। তাদের কথা মনে হলেই দুঃখে মনটা ভরে যায়। কিন্তু কি করব। উপায় নেই। নিজের অদৃষ্টকে দোষ দেয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর খুঁজে পাই না।

শীতকালে একটু রাত হলেই এখানকার জনজীবন নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

শুধু এদিকে ওদিকে থেকে শোনা যায় বেওয়ারিশ কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ। আর ভেসে আসে বুনোশূয়োর এবং হাতি তাড়ানোর আওয়াজ। হাতি জুম ফসলের মহাশত্রু। আরও উপদ্রব করে নানান পাখি, হরিণ, বানর ইত্যাদি। এরা খেয়ে নেয় জুমের তরিতরকারী আর ফল ফলাদি। এদের নানান শব্দ ভেসে আসে গভীর রাতে।

গাছে গাছে উঠে চাকমারা টিন পিটিয়ে, নানান যন্ত্রের আওয়াজ করে তাদের তাড়িয়ে দেয়

যে রাতে হাতি আসে তখন পটকাবাজি, ঢাকের শব্দ আর টিন পিটানোর আওয়াজে মাঝরাতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায়।

আবার কখনও সখনও বাঘ আসে।

বাঘে কারও গরু নিয়ে যায়। কারও নিয়ে যায় শিশু। তখন

সবাই উৎকর্ণ-উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। তখন চাকমাদের হৈ—হট্টগোল আর চিৎকারে সবাই লাঠি সোটা, বর্শা আর তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তখন ওদের বিনিদ্র রজনী যাপন ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

॥ সাত ॥

লম্বাছিরা চাকমার বাড়ি ডেভাছড়া। ওর স্ত্রী পেতাঙ্গী চাকমা তাঁত দিয়ে পিঁধন (পাছড়া), খাদী (বক্ষ আবরণী) ইত্যাদি তৈরী করে। ওর কাজ মন্দ নয়। কিন্তু ক্রেতার বড় অভাব। জুঁন চাষ করে যা পায় তা দিয়ে সারা বছরের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয় না। টানাপোড়েন সংসার। ধার-কর্জ, অভাব-অনটন তাদের চিরসাথী।

তাই স্বামী স্ত্রীতে মিলে বাড়ির পাশেই কিছু মাসকলাই করেছে, যদি কিছু হয়। কিন্তু হরিণ, বানর আর পাখির দৌরাত্ম্যে ফসল রাখা যেন মুশকিলের ব্যাপার। পাখিরা আসে দিনের বেলায় আর রাতের অন্ধকারে আসে হরিণ আর বানর।

আগে একটা হারিকেন জ্বালিয়ে রাখতো সারারাত ধরে ঘরের এক কোণে। তখন ছেলে-মেয়ে ছিল না। এছাড়া কেরোসিনের দামও সস্তা ছিল। এখন সারারাত হারিকেন জ্বালিয়ে রাখার কথা ভাবতে পারে না লম্বাছিরা চাকমা। রাতভোর হারিকেন জ্বললে প্রায় চল্লিশ পয়সার তেল জ্বলবে। জ্বালাবার সামর্থ্য যেমন নেই, আবার না জ্বালিয়ে রাখলে কখন যে হরিণ বা বানর আসবে তার নিশ্চয়তা নেই।

শীতকালে সাপ-খোপের ভয় নেই। কিন্তু বর্ষাকালে সাপের বড় উৎপাত। রাতের বেলায় ছনের চালে ইঁদুরের অবাধ চলাফেরা। অঝোরে বৃষ্টি হলে ছন চুঁয়ে-চুঁয়ে ঘরের ভিতর জল পড়ে। সাপ এসে ইঁদুর ধরতে ছুটোছুটি করে সমস্ত চালময়।

কয়েক বছর আগে একটা পানক সাপ ঝুপ করে পড়েছিল মেয়ে

বান্ধবীর পাশে। বান্ধবীর বয়স তখন তিন বছর। কোনক্রমে সাপটাকে মেরেছিল লম্বাছিরা। ফণা ধরা সাপের চেহারাটা মনে পড়লে আজও আঁতকে ওঠে ও।

শীতের গভীর রাত। অন্ধকারের মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বরফের মেলা ঝরছে আকাশ থেকে। তার সঙ্গে হিমার্ত বাতাস মাঝে-মাঝে সাঁ সাঁ করে আছড়ে পড়ছে গাছের আগডালে-মগডালে। বড্ড শীত পড়েছে গত কয়েকদিন থেকে।

লম্বাছিরার ঘরের পাশে যে আম আর কাঁঠাল গাছ আছে, তাদের পাতা থেকে টুপটাপ করে শিশির ঝরছে।

পাশের গোয়াল ঘরে একটা গাইগরু আছে। ওই গরুর দুধ থেকে বিমল মাস্টারের দুধ যোগান দেয়। গরুটার যত্ন করে লম্বাছিরার বউ পেতাঙ্গী চাকমা।

ওদের দুটো বলদকে চড়াতে নিয়ে যায় লম্বাছিরার ছেলে তনিয়া চাকমা। ওর বয়স নয় বছর।

এবার কাঁপুনি শীত পড়েছে। তাই গোয়াল ঘরটার সংস্কার না করলেই নয়। গরুগুলো ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পাচ্ছে। গত ঝড়ে ওই ঘরটার বেশ ক্ষতি হয়েছিল। টাকা-পয়সার অভাবে ঘরটার মেরামত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি এতোদিন।

পেতাঙ্গী কাত হয়ে শুয়ে আছে তের বছরের মেয়ে বান্ধবীকে বুকে জড়িয়ে। গায়ে আছে ওদের পুরনো একখানা লেপ। ছেঁড়া কম্বলটা গায়ে দিয়েছে বাপ-বেটা। ছেলের দেহের উষ্ণতা বুড়োর শরীরকে কিছুটা উত্তাপিত করছিল।

পেতাঙ্গীর ঘুম আসছিল না। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত ঘুনে ধরা সংসারের নানান চিন্তা এসে ঘনীভূত হয়েছে ওর মনে। এ ছাড়া বাইরের হিমেল হাওয়া শত ছিন্ন বেড়ার ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করেছে ঘরে।

মনে পড়ছে ওর ছোটমেয়ে তনতনির কথা। তনতনি ওদের মেয়ে। পাঁচ বছর বয়সে হারিয়েছিল মেয়েটিকে। ভাল কিছু না খেতে পেয়ে বিভিন্ন রোগে ভুগতে-ভুগতে মরেছিল ও।

মনে আনতে চায়না তবু ঘুম না আসাতে আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে রাজ্যের সব অশুভ কথা মাথার মধ্যে কিলবিল করে পেতাঙ্গীর।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে ভেসে এলো। মাস কলাইয়ের ক্ষেতে হরিণ পড়েছে। ঠেলা দিয়ে উঠাল স্বামীকে। উঠে বসে নিভিয়ে রাখা হারিকেনটা জ্বালাল পেতাঙ্গী। তিন-চারটে দেশলাইয়ের কাঠি খরচ হয়ে গেল। শীতের হিমার্ত বাতাসে দেশলাইয়ের বারুদটা যেন নেতিয়ে নেতিয়ে গেছে।

চোখ রগড়াতে-রগড়াতে দরজা খুললো লম্বাছিরা। দরজা খুলতেই সারাদেহ বরফে হিম হয়ে গেল। এক হাতে বর্শা, অন্য হাতে হারিকেনটা নিল লম্বাছিরা।

আর ওদিকে পেতাঙ্গী একহাতে টিন অন্য হাতে একটা লাঠি নিয়ে এগিয়ে চললো।

কাঁচা ঘুম থেকে ওঠাতে লম্বাছিরা এগোতে পারে না। এছাড়া বুড়ো বয়সে হঠাৎ কণকণে ঠাণ্ডা হাওয়া সহ্য করতে পারছিলো না ও।

স্বামীর এই গজেন্দ্র গমন দেখে পেতাঙ্গী লম্বাছিরাকে একটা অশ্লীল গালাগাল দিল। তারপর স্বামীকে উদ্দেশ্য করে চড়া গলায় বললো, 'যে লোক তার স্ত্রীকে রাতে শান্তিতে একটু ঘুমোতে দিতে পারে না ও আবার পুরুষ কিসের ?'

অভাবে-অনটনে পেতাঙ্গীকে একেবারে রুক্ষ করে দিয়েছে। ও স্বামীকে আশ্রব্য গালাগাল দিতে দিতে চলেছে।

গালাগাল খেতে খেতে একহাতে হারিকেন, অন্যহাতে বর্শাটা সজোরে ধরে দ্রুতগতিতে মাস কলাইয়ের ক্ষেতে পৌঁছলো লম্বছিরা।

হরিণগুলোর ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনটি চওরা (হরিণ) মনের আনন্দে মাসকলাই খেয়ে চলেছে। প্রায় অনেকখানি সাবাড় করে দিয়েছে ওরা। রাগে ক্ষেপে গেছে লম্বছিরা। একটা চওরা (হরিণ)-কে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছে বার্শাটা। লক্ষ্য ব্যর্থ। একটা হরিণের লেজের ধার দিয়ে বর্শা ছুটে অন্য একটা হরিণের গায়ে লেগেছে বর্শার ডাঁটটা।

কিছুটা ব্যথা পেয়েছে বোধ হয় হরিণটা। হরিণগুলো উচ্চকণ্ঠে কাঁসার ঘণ্টা বাজানোর মতন ঢং ঢং আওয়াজ করতে করতে পালিয়ে গেছে চোখের নিমেষে।

দৌড়োতে গিয়ে একটা গর্তে পা পড়ে যায় লম্বাছিরার। বেশ ব্যথা পেয়েছে ও। বুকে চোট লেগেছে। তড়িঘড়ি পেতাঙ্গী স্বামীকে তুলে নিয়ে ঝাঁঝানি দিয়ে বলে, 'কি আমার মরদ রে, যেন চোখ টাগরা হয়ে গেছে। ঠিক মতো দেখতে পায় না কিছু!'

সারা শরীর হিমেল হাওয়ায় অবশ হয়ে গেছে লম্বাছিরার। হারিকেনটা ছিটকে পড়ে গেছে হাত থেকে। ভাগ্যে চিমনিটা ভাঙেনি।

স্বামীকে ধরে আনে পেতাঙ্গী। তুষের আগুনের পাতিলটা একটু নেড়ে চেড়ে দেয়। তারপর স্বামীকে বলে, 'আগুনের পাতিলটার ওপর বসো। শরীরটা একটু গরম করে নাও।'

স্ত্রীর কথা মতন পাতিলটার উপর পায়খানায় বসার মতো বসে লম্বাছিরা। শরীরটাকে একটু সেঁকে নেয় ও। তারপর আইলস্যাটাকে (আগুনের পাতিলটাকে) একবার পিছনে আবার সামনে রেখে সমস্ত শরীরটাকে গরম করে নিয়েছিল লম্বাছিরা। ওর নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ছেঁড়া কম্বলের নিচে ঢুকে ছেলেটাকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

পেতাঙ্গী ও নিজের দেহকে কিছুক্ষণ আগুনের পাতিলে চাঙ্গা করে নেয়। তারপর মেয়ের সঙ্গে জড়াজড়ি করে তুলোয় জট পাকানো লেপটার তলে শুয়ে পড়ে পেতাঙ্গী।

শুয়ে শুয়ে লম্বাছিরা ভাবতে থাকে, ও বুড়ো হয়ে গেছে। এ শরীরের আর দাম নেই। ওটা ঘুন ধরে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। দিন ফুরিয়ে এসেছে ওর। নৌকো ঘাটে ভিড়ে ভিড়ে প্রায়। হারিকেনের তেলও ফুরিয়েছে। একদিন দপ করে জ্বলে উঠেই হঠাৎ নিভে যাবে লম্বাছিরা চাকমা।

লম্বাছিরা আরও ভাবে একদিন ওর যৌবন ছিল, যেদিন ও ঢোল

বাঁজাত, কেউ বাঁশী বাঁজাত। ওদিকে যুবক-যুবতীরা নাচত। বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে অবিরাম নেচে যেত ওরা।

উদ্দাম ওই নাচ। দুর্বার সেই নাচ। প্রাণের স্বচ্ছন্দ আবেগে ওরা নেচে চলত। এর যেন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। এ যেম থামতে চাইতো না।

লম্বাছিরা আরও ভাবে, ওদের বাদ্যযন্ত্র থেকে উঠত ডিমিডিমি রব। কখনও দ্রুতলয়ে আবার কখনও ধীরলয়ে।

লম্বাছিরা তার নয় বছরের ছেলে তনিয়ার চুলে আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। আদর করে অস্ফুট স্বরে বলে, 'তোকে বড় হতে হবে রে।'

লম্বাছিরা তার ছেলের ভরন্ত ভবিষ্যতের কথা ভাবে। কিছুদিন পর তনিয়া নাচের দলে ধুদুগ (বাঁশী) বাজাবে। ও খুব ভাল বাঁশী বাজায়। ওদের দুটো বলদ আর নবকুমার বড়ুয়ার বারটি গরু চড়াতে যাবার সময় বাঁশী বাজাতে বাজাতে ও যখন লংতরাই পাহাড়ের দিকে এগোয় তখন বাঁশীর সুর খুব ভাল লাগে ওর কাছে। গাঁয়ের কেউ কেউ তারিফও করেছিল ওর বাঁশীর সুর শুনে।

লম্বাছিরা আরও ভাবে, জোয়ান—জোয়ানীদের নাচের দলে তনিয়া যখন বাঁশী বাজাবে তখন ও নিজে বুড়োদের ভীড়ে বসে তনিয়ার বাঁশী শুনবে। কি মজা হবে তখন!

এসব ভাবতে ভাবতে ওই ভয়ঙ্কর শীতের রাতেও লম্বাছিরার গা গরম হয়ে ওঠে। ও ভাবে তার শরীরের যা অবস্থা এতো সুখ কি তাকে দেবেন তথাগত বুদ্ধ।

।। আট ।।

আজকাল খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠি। প্রিইউনিভারসিটি পরীক্ষাতো পাশ করলাম। এবার বি এ পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছি। তাই হাত-মুখ ধুয়েই পড়তে বসে যাই। কিছুক্ষণ পর গোমতী চলে আসে।

গোমতীকে বলেছিলাম, আমার কাজ করতে হলে ময়লা কাপড়-চোপড় পরে থাকলে চলবে না। দুটি পাছড়া কিনে দিয়েছি। ব্লাউজ ও বক্ষ আবরণী কিনে দিয়েছি দুটো করে। সাবান, তেল তো আমার এখানেই পায়।

আমার ডেরাতে এসে গোমতী প্রথমেই কুয়োর জল তোলে। খানিক পর বাঁশের ঘেরা দেয়া বাথরুমে ঢুকেই সাবান দিয়ে ভাল করে চান করে নেয়। তারপর সুগন্ধি তেল মাথায় দিয়ে আমার প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে।

ইতিমধ্যে আমিও তৈরী হয়ে যাই। প্রাতঃভোজন সেরে-সুরে ছুটে চলি স্কুলের উদ্দেশ্যে।

স্কুলের কাজ শেষ করে ডেরাতে ফিরে দেখি ঘরটা সাজানো-গুছানো হয়ে গেছে। সব কিছু ছিমছাম। রান্না বান্নাও শেষ।

উঠোনের একপাশে কিছু ফুলগাছ লাগিয়েছে ও। ওই গাছ থেকে ফুল এনে আমার পড়ার টেবিলের ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে গোমতী।

একদিন গোমতীকে বলেছি এভাবে ফুলগুলো ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখবে। লক্ষ্য করেছি, কোনদিন ও ভুল করেনি ওই কাজটি করতে।

ও জানত আমি শিক্ষিত, শহুরে ব্রাহ্মণের ছেলে আর ও অশিক্ষিতা, গেঁয়ো এক চাকমার মেয়ে। আরও বুঝতো ও পরের চাকরী করে খায়

তবুও আমার মতন হতে চেষ্টা করতো। আমার মতন ছিমছাম

থাকতে ভালবাসত। আমার মতো চলতে ফিরতে পারলে খুশি হতো গোমতী।

আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখেছি, এর পিছনে কোন বদ উদ্দেশ্য ছিল না। এমনিতেই ও শহুরে লোকের মতো হতে চাইতো। ওরকম হবার জন্যে ছিল ওর উদগ্র আকাঙ্ক্ষা। শহুরে লোকদের আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা, চাল-চলন ও আমার কাছ থেকে শিখে নিতে চেষ্টা করতো।

মাঝে মাঝে সেজেগুজে খুশির আবেগে ও বলতো, 'আমি পারছি। শহুরে লোকদের মতন হতে পারছি মাস্টার বাবু?'

মাঝে মধ্যে ভালমন্দ রান্না করে ও আমায় জিজ্ঞেস করতো, 'শহুরে লোকদের মতো রান্না হয়েছে?'

ওর অধীরতা লক্ষ্য করে খুশি করার জন্যে বলতাম, 'হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। খুব ভাল হয়েছে। অপূর্ব।'

গোমতী অভিমানের সুরে বলতো, 'আমাকে ঠাট্টা করছেন? ভাল হয়নি বুঝি!' তারপর অন্তরঙ্গ স্বরে বলতো, 'আমার গা ছুঁয়ে বলুন ভাল হয়েছে কিনা?'

আমি ওর গা ছুঁয়ে বলতাম, 'এখনও পুরোপুরি পারিসনি। চেষ্টা করলে হয়তো কখনও—সখনও পারবি। চেষ্টা করে যা।'

ওর ঝোঁক দেখে কয়েকটা রান্নার বই কিনেছি। মাঝে-মাঝে ভাল-ভাল রান্না করার কৌশল পড়ে শোনাতাম। গোমতী খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব জেনেশুনে শহুরে রান্না-বান্না রপ্ত করার চেষ্টা করতো।

তার ফুলের সখ দেখে আগরতলা থেকে একবার কিছু ভাল জাতের ফুলের বীজ এনে ডেরার উঠোনে লাগিয়েছিলাম। ফুলের চারাগুলোর ও বেশ যত্ন করতো। খুব আগ্রহ সহকারে ওইগুলো বড় করে উঠিয়েছে।

আমি যখন বিকেলে বেড়াতে যেতাম অথবা কোন ছেলে স্কুলে গেল না অথবা কোন মেয়ে স্কুল কামাই করেছে অথবা কেউ তাদের ছেলেমেয়েদের পড়া বন্ধ করে দিয়েছে, এসব কারণ অনুসন্ধান করতে

গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরতাম, তখন গোমতীর হাতে বিশেষ কোন কাজ থাকতো না। ও ডেরাটিকে আরও সুন্দর করে তুলবার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করে যেত।

আমি যখন ভোরে স্কুলে চলে যেতাম তখন ওর অবসর। তখন ও গাছের যত্ন করতো। আমার ডেরার ভিতরটা সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলেছে ও। দূর থেকে দেখলে মনে হবে আমার ডেরাটা বুঝি নন্দন কানন অথবা স্বপ্নপুরী।'

একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি তনিয়ার মা দুধ দিয়ে যাচ্ছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিগো, তুমি কেন দুধ দিয়ে যাচ্ছো, তনিয়ার বাপ কই?

পেতাঙ্গী নিরাশ গলায় উত্তর দিল, 'বেশ কিছুদিন ধরে উনি বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না। ভারী অসুখ। মাঝে মাঝে ঘুষ ঘুষ জ্বর হচ্ছে।'

বললাম, 'আজ বিকেলে দেখতে যাব'

বিমর্ষ বদনে পেতাঙ্গী চলে গেল।

ওই দিন বিকেলে বেড়াতে বেরোব এমনি সময় গোমতী বললো, 'মাস্টারবাবু, দুধ গরম করেছি, খেয়ে যান।'

বললাম, 'ফিরে এসে খাব!'

গোমতী শুকনো কণ্ঠে বললো, 'একটু পরে বেড়াতে বেরোলে কি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে!'

ঝাঁঝানি দিয়ে বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আন—আন। দেরী করিস নি আজ আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।'

গোমতী আমার মুখের দিকে নিথর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ।

আমি ওর মুখের ওপর বললাম, 'আমার দিকে এমনি করে চেয়ে আছিস্ কেন? আমি কি চিড়িয়াখানার জানোয়ার!'

গোমতী মুখ চুন করে রান্না ঘরে চলে গেল।

তারপর কাপে করে দুধ এনে আমার হাতে তুলে দিয়ে কপট রাগের

সঙ্গে বললো গোমতী, 'আপনার মা মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। নইলে আরও কত যে মুখ ঝামটা খেতেন কে জানে ?'

মার মুখের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। গোমতীর মুখের সঙ্গে মায়ের প্রতিচ্ছবিটা মিলাতে চেষ্টা করলাম। পেলাম না কিছুই।

আর কোন কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ দুধটুকু খেয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

যাবার সময় একবার লম্বাছিরা চাকমার বাড়ি ঘুরে গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম সত্যিই ও জ্বরে খুব কষ্ট পাচ্ছে। ওর বউ-এর কাছ থেকে জানতে পারলাম ও দিনরাত কাঁদে আর হাঁপায়। নিঃশ্বাস ফেলতে ভয়ানক কষ্ট হয়। বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে লম্বাছিরা।

আসবার সময় ওদের বলি, 'লংতরাই পাহাড়ের উপর শিব মন্দিরের সামনে যে ডোবা আছে, ওই ডোবা থেকে জল এনে খাওয়াও না। লোকে বলে ওই জল খেলে নাকি যে কোন রোগ সেরে যায়।'

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে পেতাঙ্গী মাথা নেড়ে বললো, 'তাই করবো মাস্টারবাবু।'

তারপর উদাস মনে ছামনু গ্রামের দিকে চললাম। কারণ চার-পাঁচটি ছেলে বেশ কয়েকদিন অবধি স্কুলে যাচ্ছে না। ব্যাপার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে।

ছামনু গাঁয়ে এসে ওদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করে কিছু হিতোপদেশ দিয়ে লংতরাই পাহাড়ের দিকে ছুটে চললাম।

গত কয়েকদিন থেকে মনটা কি জানি কিসের জন্যে হা-হুতাশ করছে। কারণ খুঁজে খুঁজে কিছুই পাচ্ছি না। দেহ-মন সবই ভারাক্রান্ত।

ছুটতে ছুটতে একসময় লংতরাই পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছলাম।

দেখলাম কতকগুলো পাহাড়ী ছেলে অনেকগুলো গরু-বাছুর নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। গরুগুলোর গলায় বাঁশের ঘণ্টা।

ওগুলো যখন দুলিয়ে-দুলিয়ে পাহাড় থেকে নামছে তখনি গরুর গলার ঘণ্টার পটাস-পটাস শব্দ বেরুচ্ছে।

তড়তড় করে পাহাড়ের উপরে উঠে পড়লাম। দেখলাম কিছু পাহাড়ী লোক ছন বাঁশ নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছে, 'কোথায় যাচ্ছেন মাস্টারবাবু ?'

আমি উত্তর দিলাম, 'কোথায়ও না। ইতি উতি একটু ঘুরে পাহাড়টা দেখছি।'

আরেকটু এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একটা অগভীর ঝরণা ঝিরঝির করে জল বেয়ে চলেছে পাথরের আড়ালে। ওই ঝরণার বুকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছোট বড় পাথরের মেলা। কতোরকম ফার্ণ, শ্যাওলা, লতা পাতা জন্মেছে ঝরণার আশে-পাশে, ঝরণার আনাচে-কানাচে। চারটি গাছ দাঁড়িয়ে আছে ঝরণার উভয় পারে। ওরা যেন পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। তাদের আলিঙ্গন প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় যে ফাঁকটুকুর সৃষ্টি হয়েছে তা দিয়ে সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকু পড়ে অপরূপ এক লালিত্যের সৃষ্টি হয়েছে ঝরণায়।

অদূরে দেখা যাচ্ছে জুম ক্ষেত। কার্পাসে, সবজিতে, ফলে ভরে আছে বিস্তীর্ণ মাঠ, যেন হাট বসেছে সারি সারি করে। পাহাড়ের ঢালুতে ফলের গাছগুলো ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নাচছে। ফলে সবজিতে বিচিত্র রঙের বাহার। কতকগুলো গাছ সাঁই-সাঁই করে বেশ বড় সড় হয়ে উঠেছে। উঁচু ডালগুলো বাতাসে হেলছে-দুলছে।

পাশে দেখা যাচ্ছে জুমের টংঘর। টংঘরের সামনে একটা বারান্দা। জুমিয়ারা খাড়ায় সবজি ভরে টংঘরের বারান্দায় রাখছে। কেউ ফল খাড়ায় ভরে নিয়েছে। আবার কেউ কাপড়ে বাঁধছে লাল, হলুদ, সবুজ রঙ ধরা মরিচ। সুরেলা কণ্ঠে ডাকাডাকি, হাঁকপাঁক চলছে চারদিকে।

মুক্ত আকাশ, পাহাড়ের উপত্যকায় সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে আসছে। পশ্চিমের আকাশে সূর্য ডুবুডুবু।

ঝরণার নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে জুতো খুলে ঝরণার মাঝে

এক উঁচু পাথরে বসে পড়লাম। ঝরণা ধারা মৃদু কলতানে সুমধুর ছন্দে আপন মনে বয়ে চলেছে।

পাদুটো ঝরণার বহমান জলে ডুবিয়ে দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ বসে আছি ঝরণার উপরে। এমন সুন্দর, স্নিগ্ধ সুশীতল স্থান সত্যিই বড়ই উপভোগ্য।

আজল পুরে ঝরণার জল খেয়ে নিলাম খানিকটা। ভারী মিষ্টি জল। কি সুস্বাদু।

তখন পাহাড় নীরব-নির্জন-নিস্তব্ধ। জুমিয়ারা কিছু আগে চলে গেছে। কেউ কোথা ও নেই।

পাহাড়টার কথা ভাবতে ভাবতে ডেরার দিকে এগোচ্ছি আর ভাবছি পাহাড়টা কি অপূর্ব। কি নির্মল! কি শান্ত!

॥ নয় ॥

হিমেল হাওয়া বইছে চারদিকে। পাখিদের কলরব শোনা যাচ্ছে গাছের আগডালে-মগডালে। কয়েকটি কাক কা-কা শব্দ করে এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে যাচ্ছে। অস্পষ্ট এক আলোর ঝিলিক বিস্ফুরিত হয়ে উঠল পূর্ব দিগন্তে। তারপর ওই আলো প্রস্ফুটিত হতে হতে ভোর হয়ে গেল।

ধীরে ধীরে ডেভাছড়া গ্রামটি জেগে উঠেছে। পুব আকাশের সোনালী সূর্যের রক্তিম আভা এসে পড়েছে গাঁয়ে। একটু পরে সমস্ত আকাশ আলোয় ভরে দেবে রোদ।

লম্বাছিরা চাকমার বারো বছরের ছেলে তনিয়া সাঁই সাঁই করে বেড়ে গেছে। ওলংতরাই পাহাড়ে যাচ্ছে গরুগুলোকে চড়িয়ে আনতে। ফিরবে সেই সন্ধ্যেবেলা।

নবকুমার বড়ুয়ার গরু চড়ানোর ভার তনিয়ার ওপর। গোটা বার

গরু বড়ুয়ার। এর বিনিময়ে নবকুমারের কাছ থেকে মাসের শেষে পায় দশ টাকা।

নিজের দুটো বলদ আর নবকুমার বড়ুয়ার গরুগুলো নিয়ে বাঁশী হাতে তনিয়া চলেছে লংতরাই পাহাড়ে। পিছনে পিছনে চলেছে ওর পোষা কুকুর টম।

ওদের বাড়ির সীমানা পেরিয়ে বেশ কিছু দূর গেছে এমনি সময় ওর বড় বোন সপ্তদশী বান্ধবী পিছু ডাকলো, "এই তনিয়া—তনিয়া, শোন।"

'কিরে দিদি ?' ঘাড় বেঁকিয়ে তনিয়া জিজ্ঞেস করে।

ছোট ভাইয়ের কাছাকাছি এসে বান্ধবী বললো, লংতরাই পাহাড়ে যাচ্ছিস, আমার জন্যে এক কোঁচড় ঝুমুর ফুল আনবি কিন্তু। মালাছরা (মালা) গাঁথব।'

তনিয়া বুক সটান করে ঠোঁট উল্টে বললো, 'এতগুলো গরু নজরে রাখা কি চাট্টিখানা কথা। আমার সময় কই !'

'ন্যাকামি করতে হবে না।' মুখখানা কিম্ভূতাকিমাকার করে বান্ধবী বলে ওঠে।

উদাস গলায় তনিয়া বলে, আচ্ছা দেখবো। যদি হাতের কাছে পাই তবে আনবো কিন্তু।'

'না আনলে কিন্তু রাগ করবো, বলে দিচ্ছি।' অন্তরঙ্গ স্বুরে বলে বান্ধবী।

স্নেহভরা কণ্ঠে বলে তনিয়া, 'তুই বড্ড অবুঝ দিদি। তোর যা চাই, তা এক্ষুনি চাই।'

অসংযত গলায় কপট রাগের সঙ্গে বলে বান্ধবী, 'আমার আজই চাই।'

'তুই এমন গোঁ ধরিস যে তোকে বোঝাবে কার বাপের সাধ্যি।' মাথা চুলকাতে চুলকাতে তনিয়া বলে। একটু থেমে ও আবার বলে, 'বলছি তো দেব এনে। তবে আজই দেবো কিনা বলতে পারছি না।'

'কাল মানিকপুরের মেলা না। মেলাতে যাবো ঝুমুর ফুলের মালা পরে।'

আর কথা না বাড়িয়ে তনিয়া বললো, 'আচ্ছা আনবো।'

তনিয়া একটা বলদের পিঠে পাচনের ঘা মেরে হেট-হেট শব্দ করতে করতে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললো।

বান্ধবীর মালার দরকার মেলাতে যাবার জন্যে নয়। কাল হেড-মাস্টারবাবুর ছেলে অরিন্দম কারবারি আসছে ওদের বাড়ি। তাই ঝুমুর ফুলের মালা গলায় পরে প্রেম নিবেদন করবে বান্ধবী।

অরিন্দম ছেলেটি বেশ ভাল গায়। জুম ক্ষেতে ফসল পাহারা দেবার সময় বিভিন্ন টংঘরে যে লাঙ্যা-লাঙনী গীত (গীতি-দ্বন্দ্ব) হয় তাতে অরিন্দম এক বিশেষ ভূমিকা নেয়।

জুম পাহারার কাজ নিতান্ত একঘেঁয়ে। ভিন্ন ভিন্ন মোনঘর (টংঘর) থেকে যুবক-যুবতীদের মধুর সরস গীতি-দ্বন্দ্বে নিস্তব্ধ বনভূমি রসঘন হয়ে ওঠে।

জুমে পাহারা না দিলে বুনো পশু-পক্ষীরা জুম ফসল খেয়ে ফেলে। বুনো হাতি জুম ফসলের ভীষণ শত্রু। ওরা দল বেঁধে এসে জুম ফসল খেয়ে যায়। তাই নানান বাদ্যযন্ত্র নিয়ে রাত জেগে পাহারা দেয় পাহাড়ীরা।

জুমে জন্তু-জানোয়ার আর পাখি তাড়াবার জন্যে জুমক্ষেতের নানা স্থানে মৃত্তিঙ্গা বাঁশের কল তৈরী করে ওরা। তাতে বেতের দড়ি বেঁধে ওই দড়ি নিয়ে যায় টংঘরে। জুমে যারা পাহারা দেয় ওরা মাঝে মধ্যে দড়িতে একবার টান দেয় আবার ছেড়ে দেয়। যন্ত্রে আওয়াজ হয় ঠক্-ঠক্-ঠক। ভয়ে বন্য জন্তুরা আর পাখিরা পালিয়ে যায়।

বান্ধবীর গলাও অপূর্ব। মেয়ের দলের মধ্যে ও থাকলে গান হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। তখন নীরস জুম পাহারা হয়ে ওঠে সরস। একঘেয়ে জুম পাহারা হয়ে যায় আনন্দমুখর। গানের উদ্দীপনায় সবাই ঝেড়ে ফেলে একঘেয়েমির ক্লান্তি-শ্রান্তি-অবসাদ।

পাহাড়ের কাছাকাছি এসে তনিয়ার দেখা হয় ছোইচাং চাকমার সঙ্গে।

ছোইচাং চাকমা হলো গোমতীর বাবা। ও মাঝে মধ্যে পাহাড়

থেকে দারবুয়ো (লাকড়ী এনে হাটের দিনে ছামনু বাজারে বিক্রী করে।

মাথায় লাকড়ী নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে ছোইচাং চাকমা।

তনিয়া বললো, 'কখন পাহাড়ে গেছিলে ছোইচাং কাকা?'

ছোইচাং বলে, 'একটু অন্ধকার থাকতে গেছিলাম। বুড়ো হয়ে গেছি, রোদ উঠলে আর কোন কাজ করতে পারি না।'

একটু থেমে ছোইচাং বলে, 'গরুগুলো আজ পশ্চিমদিকে যেতে দিস না। হাতি নেমেছে ওদিকে। আমি তাদের ডাল ভাঙার শব্দ শুনেছি। এরা পুবদিকে আসবে না। কান খাড়া করে কিন্তু রাখিস আজ।'

কথাগুলো বলে ধীরে-ধীরে ছোইচাং চাকমা তানিয়াকে পিছনে ফেলে বাড়ির দিকে এগোয়।

তনিয়া গরুগুলো নিয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে। ছোইচাং কাকার কথা মতো ও গরুগুলোকে নিয়ে পুব দিকে চলে এসেছে।

অনেকক্ষণ গরুগুলোকে চড়িয়ে দুপুরবেলায় এক গাছের নীচে বসে পড়ে তনিয়া। আগের দিনের ভাত আর তরকারী এনেছে সঙ্গে। ওগুলো গোগ্রাসে গিলে ফেলে। টমকেও কিছু খেতে দিয়েছে।

তারপর একা-একা বসে থাকে গাছের তলে। গরুগুলো গলায় বাঁশের ঘণ্টা দুলিয়ে-দুলিয়ে পটাস-পটাস শব্দ করতে-করতে চারদিকে ঘাস পাতা ছিঁড়ে খায়। ওগুলোর পিছনে-পিছনে আছে টম। ও তাদের পাহারা দেয়।

ধীরে-ধীরে নরম রোদটা পিঠের ওপরে এসে পড়ে। জঙ্গল-জাগড় থেকে বুনো গন্ধ ভেসে আসে। নানান পাখির ডাক শুনতে পায় তনিয়া।

ওদিকে বাঁশের ঘণ্টাগুলো যখন ঘুম পাড়ানি সুর তুলে, তখন তনিয়া গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে নেয় কিছুক্ষণ।

বেলা অপরাহ্ন।

পশ্চিমের আকাশে সূর্য ঢলে পড়েছে। পাহাড়ের চড়াই-উতরাই অঞ্চলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

তাই গরুগুলোকে একত্র করে হেট হেট শব্দ করতে-করতে তাদের নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে তনিয়া। ফিরে চলেছে টমও।

তনিয়া একমনে বাঁশী বাজাতে-বাজাতে বাড়ির দিকে এগোয়।

॥ দশ ॥

যথারীতি দ্বিতীয় পীরিয়ড তৃতীয় শ্রেণীতে অঙ্কের ক্লাস নিচ্ছি, এমনি সময় হেডমাস্টার মশায় দপ্তরীকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন, আমি যেন স্কুল ছুটির পর ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাই।

স্কুল ছুটি হয়ে গেছে দশ মিনিট আগে। সব ছাত্রছাত্রী আর মাস্টার মশায়েরা স্কুল ছেড়ে চলে গেছেন। আমি হেডমাস্টারবাবুর চেম্বারে ঢুকলাম।

আমায় দেখে হেডমাস্টার মশায় হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন, 'এই যে বিমলবাবু, বসুন। আপনি তো বলেছিলেন আমাদের চাকমা সমাজের কোন অনুষ্ঠান হলে আপনাকে যেন জানাই। আমার বাড়িতে আগামী রোববার মাঘী-পূর্ণিমা উৎসব, তাই আপনার নিমন্ত্রণ রইলো। আপনি যাবেন তো?

'নিশ্চয়ই। কটায় পূজো আরম্ভ হবে?'

'সকাল আটটায়।

'অবশ্যই যাব।'

হেডমাস্টারবাবু একটা হাই তুলে আলস্য জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'চলুন আজ উঠি। আজ আর কাজ ভাল লাগছে না। কাল করবো'খন।'

হেডমাস্টার মশায়ের বাড়ি ঝালাছড়া। আমি রোববার সকাল সাড়ে সাতটায় ওঁর বাড়ি পৌঁছে দেখলাম প্রায় একশ উপাসক-উপাসিকা হেডমাস্টারবাবুর ক্যাং এ সমবেত হয়েছেন।

দেখলাম তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত। অনেকে বিভিন্ন জায়গায় জটলা করে নানান কথায় ব্যপৃত। স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক কথা বলছেন। অন্যদের মধ্যে কেউ অন্য বুদ্ধ পূর্ণিমার কথা, আবার কেউ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজনীতির কথা বলছেন। যদিও অনেকে রাজনীতির অ আ ক খ জানেন না।

সকাল সাড়ে আটটায় বুদ্ধপূজো শুরু হয়ে গেছে।

পূজো করছেন শ্রীমৎ রতনশ্রী ভিক্ষু। উনি প্রায় একঘণ্টা ধরে বুদ্ধবন্দনা, বোধিবন্দনা, স্তূপবন্দনা করে পুষ্পপূজো, প্রদীপপূজো এবং বুদ্ধপূজো করে 'মঙ্গল সুত্তং' পাঠ করেন।

পূজো শেষ হবার পর ভিক্ষু উপাসক এবং উপাসিকাদের উদ্দেশে বলেন, 'বুদ্ধপূজো শেষ হয়েছে, এবার তোমরা অন্য কাজ করো।'

রতনশ্রী ভিক্ষু উপাসক উপাসিকাদের প্রার্থনা অনুসারে ডান হাতে একটি পাখা নিয়ে তাদের পঞ্চশীল দান করলেন।

কিছু সময়ের বিরতি।

হেডমাস্টার মশায়ের অনুরোধে শ্রীমৎ রতনশ্রী ভিক্ষু মাঘী পূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, 'তথাগত বুদ্ধের সামনে শিষ্য-শিষ্যা মণ্ডলী বসে আছেন। তিনি ঘোষণা করলেন, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় ওঁর পরিনির্বাণের সংকল্প। শিষ্য ও শিষ্যাদের কাছে বলেন, সত্য ও ধর্মের চিরবৈরী 'মার'ই যখন নিজ মুখে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে, তথাগতের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীতে সুপ্রচারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন তথাগত মারকে সম্বোধন করে বলেন, 'ওহে পাপমতি মার, তুমি সুখী হও শীগগিরই তথাগতের পরিনির্বাণ হবে। আজ থেকে তিন মাস পর আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন।'

তথাগত তারপর চাপাল চৈত্যে এই মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে স্মৃতিমান ও সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় স্বীয় আয়ু সংস্কার বর্জন করেন।

তিনি সংকল্প করলেন, 'এখন থেকে তিনমাস ধরে আগামী বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত আমার প্রাণবায়ু চলতে থাকুক, এরপর অবরুদ্ধ হোক্।'

অকস্মাৎ অতি ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হলো। মুহুর্মুহু প্রলয় ঘোর মেঘগর্জন শোনা যেতে লাগলো।

আকস্মিক ভূমিকম্প ও বজ্রধ্বনিতে তথাগতের প্রধান সেবক আনন্দের মনে ভীষণ ভয়ের সঞ্চার হলো। তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে, তথাগত বলেন, 'শোন আনন্দ, বোধিসত্ত্ব যখন মাতৃকুক্ষি থেকে ভূমিষ্ঠ হন, তখন ওঁর পুণ্যতেজে পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়। যখন বোধিসত্ত্ব সম্যক সম্বোধি লাভ করেন, তখন এই পৃথিবী জ্ঞান তেজে কম্পিত হয়। যখন তথাগত ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, তখন পৃথিবী সাধুবাদ দ্বারা কম্পিত হয়। যখন তথাগত আয়ুসংস্কার পরিত্যাগ করেন, তখন পৃথিবী কারুণ্যে কম্পিত হয়। আর যখন তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন, তখন রোদন ধ্বনিতে কম্পিত হয় পৃথিবী।'

এ কথা বলে শ্রীমৎ রতনশ্রী ভিক্ষু উপাসক উপাসিকাগণের উদ্দেশে বলেন, 'চল আমরা সবাই এই পবিত্র দিনে তথাগত বুদ্ধের উদ্দেশে বলি, "হে করুণাময়, হে দয়ার সাগর, হে অনন্তজ্ঞানী, আজকের এই পৃথিবীর অসহনীয় অবস্থায় আমাদের আশীর্বাদ করুন, আপনার করুণা ও মৈত্রীর বাণী বর্ষণ করুন যাতে,

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।

[সকল প্রাণী সুখী হোক্।]

সব্বে সব্ব পাপস্স অকরণং।

[সকলকে সব পাপ থেকে বিরত করুন।]

কুসলস্স উপসম্পদা।

[পুণ্য কার্য করান।]

এবং

সচিত্ত পরিয়োদাপনং।

[তাদের নিজনিজ বিশোদন করান।]"

উপস্থিত চাকমা পুরুষ এবং রমণীরা বুদ্ধকে গড় হয়ে প্রণাম করে ধীরে-ধীরে চলে গেলেন।

আমি বুদ্ধ পূজোর প্রসাদ গ্রহণ করছি, এমনি সময়ে হেডমাস্টার মশায়ের ছেলে অরিন্দম এসে বাবাকে টুক করে প্রণাম করে বললো, 'এইমাত্র খবর এলো, আমি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাশ করেছি বাবা।'

হেডমাস্টারমশায় উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, 'খুব ভালো। বেশ খুশি হলাম। এবার কৈলাসহরে যাও। ওই কলেজে ভর্তি হয়ে প্রিইউনিভারসিটি পরীক্ষাটা পাশ করো। তারপর বি.এ. পাশ করলে সেক্রেটারী দেওয়ান মশায়কে ধরে একটা ভাল চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করবো।'

অরিন্দম নৈর্ব্যক্তিক গলায় উত্তর দেয়, 'না বাবা, আমি আর পড়াশোনা করব না।'

হেডমাস্টার মশায় চোখের মণি ভুরুর দিকে তুলে বললেন, 'তাহলে কি করবে শুনি?'

অরিন্দম সহজ গলায় বলে, 'গ্রামে একটা নৈশ বিদ্যালয় খুলব। যারা গরীব বয়স্ক, যারা পয়সার অভাবে লেখাপড়া করতে পারেনি, তাদের কিছু শেখাব।'

অবজ্ঞা দৃষ্টিতে তাকিয়ে অরুচিকর গলায় হেডমাস্টার মশায় ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি একাই করবে নাকি?'

তড়িৎবেগে অরিন্দম উত্তর দেয়, 'না—না। আমি একা কেন। অনেকে আছে।'

কৌতূহল নিরসনের জন্যে প্রশ্ন করেন হেডমাস্টারবাবু, 'আর কে কে আছে?'

'কেন ভগবান দেওয়ান মশায়ের ছেলে বিধান, বিঘ্ন বিনাশন কারবারির ছেলে পরেশ, বিশ্বেশ্বর খিসারের ছেলে অমর এবং আরও অনেকে।'

'কোথায় নৈশবিদ্যালয় খুলবে শুনি?'

'কেন—ছামনুবাজারে।'

'ঘর পেয়েছ ?'

'এখনও পাইনি। তাই আমরা ঠিক করেছি, কিছুদিনের মধ্যে গ্রামের মাতব্বর আর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি মিটিং করবো। ওখানে খুলে বলব আমাদের পরিকল্পনাটি। ভগবানবাবু, বিশ্বেশ্বরবাবু, বিঘ্নবিনাশনবাবু, আপনাকে আর এই মাস্টারবাবুকেও বাতান্যা (নিমন্ত্রণ) করব। ওঁরাই ঠিক করবেন কোথায় স্কুল হবে, কে কে পড়াবে আর কখন ক্লাস শুরু হবে।'

হেডমাস্টারবাবু হাসিখুশি মুখে দরবিগলিত কণ্ঠে বলেন, 'আমি আশীর্বাদ করি তোমাদের এ শুভ প্রচেষ্টা সফল হোক্, সুন্দর হোক্ এবং তোমাদের আশা পূর্ণ হোক্।'

আনন্দে আমিও আপ্লুত হয়ে যাই। তারপর হেডমাস্টারমশায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অরিন্দমকে বলি, 'তোমরা যুবকেরাই তো এক ভয়ঙ্কর শক্তি। তোমাদের যদি ঠিক মতো কাজে লাগানো যায় তাহলে আসরে, তোমরাই হয়ে দাঁড়াবে দেশের খাঁটি রূপকার। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি।'

॥ এগার ॥

বি. এ. পরীক্ষার আর বেশীদিন বাকী নেই। তাই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গত কয়েকদিন ধরে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠছি। স্কুলে পৌঁছাতে একটু দেরী হয়ে যাচ্ছে। প্রধান শিক্ষকমশায়কে বলেছি আমার অসুবিধের কথা। তিনি বলেছেন, 'ঠিক আছে, আপনার প্রথম পীরিয়ডে কোন ক্লাস থাকবে না। কিন্তু দ্বিতীয় পীরিয়ডের আগে অবশ্যই স্কুলে পৌঁছবেন।'

স্কুলের সকল শিক্ষকমশায়দের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছি। এটা বোধ হয় সম্ভব হয়েছে আমার সিনসীয়ারিটির জন্যে।

তাই আজও পরীক্ষার পড়াশোনা শেষ করে দ্বিতীয় পীরিয়ডের আগেই হন্তদন্ত হয়ে স্কুলের দিকে ছুটছি। হঠাৎ পথে দেখা স্কুলের সেক্রেটারী দেওয়ান মশায়ের সঙ্গে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'আরে, মাস্টারবাবু যে। কেমন আছেন?'

বললাম, 'নমস্কার স্যার। ক্ষমা করবেন, একেবারেই দেখতে পাই নি।'

'আজ স্কুলে যাননি? হন্‌হন্‌ করে কোথায় ছুটে চলেছেন?'

'স্কুলেই যাচ্ছি।'

'এত দেরী করে যে?'

'বি. এ. পরীক্ষার আর বেশী দেরী নেই। ভোর বেলার পড়াটা বেশ মনে থাকে। তাই প্রধান শিক্ষকমশায়কে বলে আমার প্রথম পীরিয়ডের ক্লাসটা অন্য একজন মাস্টার মশায়কে দিয়ে, তাঁর শেষ পীরিয়ডের ক্লাসটা আমি নিয়েছি।'

'বেশ ভাল। তারপর কেমন আছেন?'

'আপনার আশীর্বাদে বেশ ভালই আছি স্যার।'

'আপনি আসার পর থেকে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। আপনি এ অঞ্চলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে একটা নতুন উদ্দীপনা আনতে পেরেছেন।'

'এটা হলো ঈশ্বরের করুণা'।

'আপনি বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কটা বাড়িয়ে তুলেছেন, যা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনায় খুবই প্রয়োজন।'

'ঠিকই বলেছেন স্যার। আমাদের দেশের অভিভাবকেরা নানান সমস্যায় জর্জরিত। তাই ছেলেমেয়েদের জন্যে চিন্তা করার ওদের ফুরসুৎ কোথায়?'

'প্রধান শিক্ষক মশায় বলেছেন আরও দুজন শিক্ষকের প্রয়োজন।

ছাত্র-রেসিও অনুসারে আমরা নাকি আরও তিনজন শিক্ষকের জন্য সরকারের কাছে দাবী করতে পারি।'

'নিশ্চয়ই স্যার।'

'আমি কিছুদিনের মধ্যে প্রধান শিক্ষকমশায়কে নিয়ে আগরতলা যাব। আমাদের যেন আরও দুজন শিক্ষক যথাশীঘ্র দেন তারজন্য জোর দাবী জানাব।'

'তাই করুন স্যার, তাহলে খুব ভাল হবে। দয়া করে একদিন আমার ডেরাতে আসুন না স্যার।'

'কে বলে আপনার ওটা ডেরা। শুনেছি আপনি নাকি আপনার বাসাটিকে 'অমরপুরী' করে তুলেছেন।'

'ওটা আমার কাজ নয়। ওই প্রশংসা গোমতীর প্রাপ্য।'

'গোমতী আবার কে?'

'ছোইচাং চাকমার মেয়ে। আমার এখানে যে রান্না-বান্না করে।'

'ও, মনে পড়েছে। মেয়েটা সব কাজ গুছিয়ে-টুছিয়ে করতে পারে তো?'

'হ্যাঁ স্যার। সব কাজ ও শিখে নিয়েছে।'

'শুনলাম ওর বাবা নাকি তার বিয়ে দিতে চায়?'

'আমিও তার বাবাকে বিয়ে দেবার কথা বলেছি। মেয়েটার বয়েসও হয়ে যাচ্ছে।'

'হুঁ। আমি একদিন বিকেল বেলায় আপনার বাসায় যাব।'

'তাহলে খুব খুশি হব স্যার।'

উদ্বেগ কণ্ঠে সেক্রেটারীবাবু বলেন, 'আপনার অনেক সময় নষ্ট করে ফেললাম।'

আমি সহজ গলায় বললাম, 'কিছু হবে না স্যার। স্কুল ছুটির পর ছাত্র-ছাত্রীদের একটা অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে পুষিয়ে দেব।'

'হুঁ। তাই নাকি!'

'পড়া না শিখলে আমি তাদের বাড়তি ক্লাস নিয়ে ওদের শিখিয়ে তারপর ছুটি দি। দরকার হলে অন্য শিক্ষক মশায়দের চলে যেতে বলি।'

'শুনে খুব খুশি হলাম।'

'তাহলে চলি স্যার, নমস্কার।'

'নমস্কার।'

সেক্রেটারীবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জোর কদমে স্কুলে যখন পৌঁছলাম তখন দেখি দ্বিতীয় পীরিয়ড বিশ মিনিট হয় শুরু হয়ে গেছে। দেখলাম প্রধান শিক্ষক মশায় আমার ক্লাসে পড়াচ্ছেন। আমি ওঁকে ক্লাস থেকে ডেকে এনে সেক্রেটারীবাবুর সঙ্গে যে পথে দেখা হয়েছে, তা সংক্ষেপে বলে ক্লাসে ঢুকে পড়লাম। যে ক্লাসটিতে আমি দেরীতে ঢুকেছিলাম ওই ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের বললাম স্কুল ছুটির পর ওদের ক্লাসটি আবার নেব।

স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। ওই ক্লাসটিতে ঢুকে আবার পড়াতে শুরু করলাম। সব মাস্টারমশায়েরা চলে গেছেন। দপ্তরীকেও চলে যেতে বলেছি। প্রধান শিক্ষক মশায়ও চলে যেতেন কিন্তু সেক্রেটারীবাবু কি বলেছেন তা শোনার জন্যে উনি বসে আছেন। আমাকে বললেন, 'ক্লাসটা সেরে আসুন, এক সঙ্গেই যাব।'

ক্লাস শেষ করে, ছাত্র-ছাত্রীদের ছেড়ে দিলাম। আমি নিজেই ক্লাস রুমটির দরজা-জানালা বন্ধ করে, প্রধান শিক্ষক মশায়কে নিয়ে ডেরার দিকে এগোলাম।

ধীরে ধীরে আমরা এগোচ্ছি, এমনি সময় প্রধান শিক্ষক মশায় আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'সেক্রেটারীবাবু কি বললেন?'

বললাম, 'আপনি নাকি বলেছেন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে, তাই অবিলম্বে শিক্ষকের প্রয়োজন।'

'সত্যি কথাই তো বলেছি।'

'আপনাকে নিয়ে সেক্রেটারীবাবু আগরতলায় যাবেন। ওখানে শিক্ষকের জন্যে দরবার করবেন।'

তাহলে খুব ভাল হবে। চিঠি লেখালেখি করে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো যায় না। আপনার আসার আগে তো বহুবার দরবার করে তবে আপনাকে পেলাম। আর কি বললেন?'

আমার ডেরার কথা, পরীক্ষার কথা, আমার প্রথম পীরিয়ডটা যে রিলিফ দিয়েছেন, তার কথা বলেছি। সব শেষে গোমতীর বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলেন।'

'গোমতীর বিয়ে সম্পর্কে আপনাকে বলবো-বলবো বলে ভাবছি। কিন্তু আপনি পরীক্ষা নিয়ে এত ব্যস্ত যে, তাই আপনাকে বিরক্ত করছি না।'

'কেন কি হয়েছে?'

'ওর মা-বাবা আমার বাড়ি গিয়েছিল, মেয়েটার বিয়েথার ব্যাপার নিয়ে।'

'আচ্ছা। ওরা কি বললো?'

'ওরা বলেছে মেয়েটার বয়েস হয়েছে, এখন বিয়ে দেয়া দরকার।'

'আমি তো তাদের বলেছি মেয়ের বিয়ের জন্য একটা ভাল বর খুঁজতে। দরকার হলে বিয়েতে আমিও কিছু সাহায্য করব।'

'কিন্তু ওর মা-বাবা বলেছে গোমতী নাকি এখনি বিয়ে করতে চায় না।'

'কেন বলুন তো?'

'গোমতী নাকি বলছে ও চলে গেলে আপনার খুব অসুবিধে হবে।'

'আমার অসুবিধে হলে ওর কি?'

'আপনি নাকি তাকে বিশেষ স্নেহ করেন। তাই আপনাকে ছেড়ে কোথায়ও যাবে না।'

'আইবুড়ো হয়ে থাকবে নাকি?'

'বিয়ে গোমতী করবে, কিন্তু এখন নয়। ও নাকি বলেছে আপনার বিয়ে হয়ে গেলে, আপনার স্ত্রীর কাছে আপনাকে সঁপে দিয়ে তবে ও বিয়ে করবে।'

'তাই নাকি।'

'ওর মা বাবা কি বলেছে ?'

'তারা আপনার মতামত জানতে চান।'

'আপনি কি বললেন ?'

আমি বললাম 'গোমতী যখন বলছে, মাস্টারবাবুর অসুবিধে হবে তাহলে এখন থাক্। পরে দেখা যাবে।'

হেডমাস্টারবাবু আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি এখন বিয়ে করবেন ?'

'না স্যার। আগে এম. এ. পাশ করে নি। তারপর ওদিকটা দেখব।'

'এত দেরী করবেন ?'

বিয়েথা করলে আর পড়াশোনা মোটেই হবে না। ছেলেপুলের চিন্তা করতে-করতে পড়াশোনা চুলায় যাবে।'

'ঠিকই বলেছেন। আমারও ইচ্ছে ছিল আরও পড়াশোনা করি। কিন্তু বাবা খুব শীগগির বিয়ে করিয়ে দিলেন। তাই সব পণ্ড হয়ে গেল।'

হঠাৎ আমি হেডমাস্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা স্যার, লোকে গোমতীকে নিয়ে আমার সম্পর্কে কোন কথা বলে কি ?'

'না। আমি ওই সম্পর্কে কারও কাছ থেকে আজ অবধি কোন কথা শুনিনি।'

'ওর মা-বাবা, গোমতী এবং আমাকে নিয়ে কোন কথা বলেছে কি ?'

'না, ওরাও কিছু বলেনি। তারা আপনাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। আপনি থাকাতে নাকি ওরা খেয়েদেয়ে বেঁচে আছে।'

আমি আর কিছু বলতে পারিনি। শুধু বিরস গলায় বললাম, 'হুঁ।'

ঐই দিন আমাদের আর কোন কথা হয় নি। বেলা অনেক হয়ে গেছে দেখে উভয়েই যার যার বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

॥ বার ॥

অসংখ্য বুলবুলি এসেছে লম্বাছিরার মরিচক্ষেতে। যেন বুলবুলির মেলা বসেছে। ওরা খেয়ে চলেছে মরিচগুলো। ওগুলো বেশ লাল লাল। লালমরিচ তাদের ভারী পছন্দ।

বাপ-বেটা কেউই বাড়ি নেই।

তনিয়া ওই ভোরে লংতরাই পাহাড়ে গেছে গরু চড়াতে। আর বাপ গেছে অভিরাম বড়ুয়ার কাছে হালদেয়ার টাকার তাগিদে।

আজ চার মাস হলো নিজের বলদ নিয়ে অভিরাম বড়ুয়ার ক্ষেতে হাল দিয়ে এসেছে। পঞ্চাশ টাকা উনি আজও দিচ্ছেন না। 'আজ দেব', 'কাল দেব' বলে কেবল তারিখ ফেলছেন।

মা-মেয়ে দৌড়ে গেল বুলবুলি তাড়াতে। কিন্তু অনেক বুলবুলি দেখে ওদের চোখ ছানাবড়া। কি করবে ভেবে পায়না কিছু। ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় লাঠি, বর্শা, তীর ধনুক কিছুই আনেনি কেউ।

ক্ষেতের কাছে এসে পেতাঙ্গী আর্তনাদ করে উঠলো। পাগলের মতন দু-হাত তুলে ইতিউতি দৌড়োতে থাকে। মাথার চুল খুলে গেছে। পাছড়াও খুলে যায়—যায় আর কি।

ওদিকে মেয়েও মাকে অনুসরণ করে শুধু আস্ফালন করছে। মুখ ব্যাদন করে নিষ্ফল শব্দ করতে থাকে বান্ধবী।

আকুল হয়ে মা-মেয়ে দুজনে রণচণ্ডী মূর্তিতে হৈ-চৈ করছে। ছট্‌ফট্‌ করে উন্মাদের মতো একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে ওরা। কিন্তু চঞ্চল বুলবুলিগুলোর তাতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা ফুরুৎ-ফুরুৎ শব্দ করে মরিচ-ডালে লেজ নাচিয়ে-নাচিয়ে লাফাচ্ছে আব জোর কদমে লাল লাল মরিচ টপাটপ গিলছে।

আর্ত বুকফাটা হাহাকার করে তথাগত বুদ্ধকে ডাকতে থাকে পেতাঙ্গী চাকমা।

ঠিক এমমি সময়। পিছন থেকে হঠাৎ কেউ 'গুলতি' ছুঁড়ে সব বুলবুলি তাড়িয়ে দিল। ওরা ট্যাঁ—ট্যাঁ—ট্যাঁ শব্দ করে ডাকতে-ডাকতে এক-এক করে উপরে উঠে গেল।

কেন এতগুলো বুলবুলি হঠাৎ পালিয়ে গেল তার [redacted] খুঁজতে থাকে পেতাঙ্গী চাকমা।

রাশি রাশি বুলবুলির এই চকিত ভয় পাওয়ায় পেতাঙ্গী ও বান্ধবীর সহজাত বুদ্ধিকে বলেছিল, বুলবুলিরা কোন জানোয়ার-টানোয়ার বা মানুষ-টানুষ দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে। মা-মেয়ে এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে খুঁজছে ওই মানুষ অথবা জানোয়ারটিকে।

এমন সময় পিছন থেকে হেডমাস্টার বাবুর ছেলে অরিন্দম খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে। ওই হাসি ছিল উদ্দাম—উন্মুক্ত—প্রাণখোলা।

পেতাঙ্গী অরিন্দমকে দেখে বেশ লজ্জা পেয়ে যায়। মাথায় চুল বেঁধে নেয়। পাছড়া-ব্লাউজও টেনে-টুনে ঠিক করে।

ওদিকে বান্ধবীও লজ্জায় লজ্জাবতী লতার মতন হয়ে গেছে। ধরলেই এখনি বুজে যাবে বোধ হয়। বক্ষ-আবরণী টেনে দেয়। পাছড়া-ব্লাউজও ঠিক করে আনত চোখ নতমুখে জড়সড় হয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও।

পেতাঙ্গী চাকমা সোহাগ স্বরে বলে, 'অরিন্দম, তুমি—।' তারপর স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'তুমি আজ আমাদের বাঁচালে অরিন্দম। তথাগত বুদ্ধই তোমাকে পাঠিয়েছেন।'

ওরা তিনজনে লম্বাছিরার বাড়ির দিকে চললো। যেতে-যেতে অরিন্দম পেতাঙ্গীকে বলে, আমি কিছুক্ষণ আগেই এসেছিলাম মাসী। ব্যাগে আমার সব সময় 'গুলতি' থাকে। অনেকক্ষণ ধরে প্রাণভরে মা-মেয়ের নাচ দেখলাম। ওঃ কি নৃত্য। উদ্দাম নৃত্য— দুর্বার নৃত্য চলেছিল বহুক্ষণ ধরে। বেশ উপভোগ করেছিলাম ওই বিরামহীন নাচ।'

পেতাঙ্গী আগে আগে এগোচ্ছিল। পিছনে পিছনে চলছিল বান্ধবী আর অরিন্দম।

অরিন্দমের কথাটা শুনে পেতাঙ্গীর চোখ মুখ লজ্জায় আরক্ত হয়ে গেছে। আর ওদিকে বান্ধবী অরিন্দমকে একটা চিমটি কেটে অস্ফুট স্বরে বললো, 'তুমি ভারী অসভ্য।'

চিমটি খেয়ে অরিন্দম আর্তনাদ করে উঠলো। পেতাঙ্গী ঘাড় বেঁকিয়ে তির্যক চোখে অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করে, 'কি হলো অরিন্দম' ?

অরিন্দম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে কিছু নয় মাসি, একটি লাল পিঁপড়ে কামড়িয়ে দিয়েছে।

তিনজনে আবার বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ অরিন্দম বান্ধবীর খোঁপা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ফিসফিস গলায় বলে, 'মেয়ের নাচ দেখে বেশী তৃপ্তি পেয়েছিলাম।'

বলতে বলতে ওরা তিনজনে লম্বাছিরা চাকমার বাড়ী এসে ঢুকলো।

অরিন্দমের কাঁধে ঝোলানো একটা ব্যাগ ছিল। ওই ব্যাগ থেকে দুটো পুটলি বের করে পেতাঙ্গীর হাতে দিয়ে বললো, 'মাসি' এগুলো ঘরে নিয়ে যাও।'

মাসী উৎফুল্ল স্বরে জিজ্ঞেস করে, 'ওগুলোতে কি আছে অরিন্দম ?'

সহজ গলায় অরিন্দম বলে, 'একটাতে আছে শূয়োরের মাংস এবং অন্যটাতে আছে খাসার চাল।'

পেতাঙ্গী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। অনেকদিন শূয়োরের মাংস খায়নি। কোন্ দিন শূয়োরের মাংস খেয়েছিল মনে করতে চায় পেতাঙ্গী। কিন্তু অনেকদিন আগেকার কথা। তাই মনে করতে পারে না কিছু।

পেতাঙ্গী অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি খেয়ে যাবে তো অরিন্দম ?'

'না—না। আমার অনেক কাজ আছে। আমাকে এখনি বেরোতে হবে।'

'কোথায় যাবে ?'

'ভগবানচন্দ্র দেওয়ান, বিঘ্নবিনাশন কারবারি আর বিশ্বেশ্বর খিসা মশায়দের কাছে যাবো।'

'কেন, কি ব্যাপার ?'

'আমরা কয়েকজন মিলে ঠিক করেছি গ্রামে একটা নৈশ বিদ্যালয় খুলব বয়স্কদের স্বাক্ষরতা শেখাবার জন্যে। যারা অভাবের তাড়নায় সময় মতন লেখাপড়া করতে পারেনি তাদের স্বাক্ষর দানে সমর্থ করিয়ে তাদের কিছু পড়াশোনা করাব।'

ওরা দুজনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়।

পেতাঙ্গী জিজ্ঞেস করে, 'ওদের লেখাপড়া শেখালে কি লাভ হবে?'

'তাদের মধ্যে নাগরিক সচেতনতা জাগবে এবং জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক সংহতি দৃঢ় হবে।'

[illegible] বান্ধবী অরিন্দমকে প্রশ্ন করে, 'অরিন্দমদা, নাগরিক সচেতনতাটা কি তাতো ঠিক বুঝতে পারলাম না?'

অরিন্দম গম্ভীর গলায় উত্তর দেয়, 'তাহলে শোন, যদি বয়স্কদের কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে অল্প বিস্তর শিক্ষিত করে তুলতে পারি তবে ওরা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নিয়ম কানুন শিখবে এবং ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে ওইগুলো প্রয়োগ করে তাদের পারিবারিক জীবনের স্বাস্থ্য সমৃদ্ধিতে সমুজ্জ্বল করে তুলতে পারবে।'

পেতাঙ্গী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে অরিন্দমের মুখের দিকে।

বান্ধবীর চোখে মুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। কৌতূহল নিরসনের জন্যে ও অরিন্দমকে প্রশ্ন করে, 'আর কি কি সুবিধে হবে অরিন্দমদা?'

'এতে বয়স্কদের মধ্যে নাগরিকতা বোধ সৃষ্টি করবে। ওদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবে, যাতে ওরা শান্তি ও প্রগতির পথে চলতে সক্ষম হয়ে দেশকে সাহায্য করতে পারে।'

ফসিল হয়ে গেল কয়েকটা মুহূর্ত।

আবার বান্ধবী অরিন্দমকে জিজ্ঞেস করে, 'এখন ভগবানবাবু, বিঘ্নবিনাশন বাবু তাদের কাছে কেন যাবেন?'

ওঁদের কাছে গিয়ে আমাদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে-শুঝিয়ে বলব। আর ওঁরা গাঁয়ের মাতব্বরদের যেন বলেন স্বাক্ষরতার উপযোগিতা সম্পর্কে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে বলতে।'

অকস্মাৎ পেতাঙ্গী অরিন্দমকে প্রশ্ন করে, 'তোমরা তো পুরুষদের স্বাক্ষরতা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, মেয়েদের জন্য কিছু করবে কি?'

'হ্যাঁ। ওই পরিকল্পনাও আমাদের আছে। কিন্তু এখন নয়।

আগে আমরা পুরুষদের কথাই ভাবছি।'

সবাই চুপচাপ। কিছুক্ষণ নীরব। ওই নীরবতা ভঙ্গ করে বান্ধবী অরিন্দমকে বলে, 'অরিন্দমদা, জুম, পাহারা তো চলে এলো। এবার জুমের গান গাইবে না?'

'অন্যান্য কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত। তবু বলেছে অনেকে [illegible]খি কোন দলে থাকি। তুমি গাইছ তো?'

'আমারও ইচ্ছে আছে। তুমি এবার কোন্ গানটা গাইবে অরিন্দমদা?'

হঠাৎ পেতাঙ্গী বলে ওঠে, 'তোমরা গান নিয়ে আলোচনা কর। আমি দেখছি এখনও তনিয়ার বাপ আসছে না কেন? ওই কোন্ সকালে গেছে আসার নাম গন্ধ নেই। টাকা পেয়ে আসার সময় দোকান থেকে কিছু চাল—ডাল আনার জন্যে বলে দিয়েছিলাম।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পেতাঙ্গী। স্বামীর খোঁজে বাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

অরিন্দম গুনগুন করে গাইতে থাকে। ওদিকে বান্ধবীও গুনগুন করে ওই গানের উত্তর দিয়ে চলেছে। একরাশ স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত ঘর জুড়ে।

গানে উদাস মনের ভাব দুজনের বেরিয়ে আসছে। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের বিরহে অধীর। কেউ কাউকে পাচ্ছে না। ওদের মাঝখানে না পাওয়ার প্রেমই অন্তরে এক অভাবনীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। মনে ব্যথার অন্ত নেই। তাই ওরা গানের মাধ্যমে ব্যক্ত করছে ওদের অন্তরের করুণ আবেদন।

ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে দুজনে। গান গেয়ে চলেছে ওরা।

অরিন্দম গেয়ে ওঠে :—

ছরমা কুরারে কি খুদ দিম,
উদাসী মনেরে কি বুঝ দিম।
ছরমা কুরায় খুদ ন খায়,
উদাসী মন বুঝ ন পায়।

[মুরগীর বাচ্চাদের কি ধানের খুদ দেব বুঝতে পাচ্ছি না। তাই আমার উদাসী মনকে কি করে বুঝাব। মুরগীর বাচ্চারা খুদ খেতে চায় না, ঐরূপ আমার মনও বুঝতে চায় না।]

বান্ধবী গায় ঃ—

দনা উজানি জুনি গেল,
পুরানি ভালেৎ দিন উদি গেল।
মাম্বারা খেইয়া ছাগল্যা,
দর্যাৎ ন ভাজের পাগল্যা।

[পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি পোকারা উড়ে চলে যাচ্ছে। অতীতের আরামের দিনগুলো আর নেই। ছাগলেরা জুমের 'মারমা' খেয়ে ফেলেছে। আর সমুদ্রে বাঁশের টুকরো ভাসছে না। ওটা তারই ইঙ্গিত।]

অরিন্দম গেয়ে চলে ঃ—

বনৎ দগরে হরিণ ছ,
ন দেলে তোরে মরিব। উ · উ·· উ

[বনে হরিণের বাচ্চা ডাকছে, তোমাকে না দেখলে মরে যাব।]

বান্ধবী গেয়ে ওঠে ঃ—

উড়ের পক্ষী তল চেইয়া,
ছাড়ি ন পারিম তর মেইয়া। উ···উ ··উ

(উড়ন্ত পাখির ছায়া নিচে পড়েছে, তোমার মায়া ছাড়তে পারবো না।)

অরিন্দম গায় ঃ—

ডিঙি কুলেম্বি ত ঘাদৎ,
মোর আসল পরান্নান তর্হাদৎ। উ···উ···উ

(ডিঙি নিয়ে তোমার ঘাটে আসব, আমার জীবনটা তোমার

হাতে সঁপে দিলাম)

গান গেয়ে চলেছে দুজনে। হঠাৎ গানের মৌজে অরিন্দম বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে। অজান্তে বান্ধবীও আঁকড়ে ধরে অরিন্দমকে।

ওরা দুজনে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

কত পল — অনুপল আর দণ্ড এমনি ভাবে কেটে গেল কে জা[illegible]

বাইরে পেতাঙ্গী চাকমার আকস্মিক চিৎকারে ওরা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উভয়ে, উভয়কে ছেড়ে দেয়।

এতোদিন অরিন্দম বান্ধবীর মানসপটে ছিল। আর আজ অরিন্দম যখন ওকে জড়িয়ে ধরেছে, বান্ধবী অনুভব করে ওই স্পর্শে যেন একটা যাদু আছে। এ ছোঁয়ায় এক বিচিত্র পুলক অনুভব করে বান্ধবী। এ যেন সীমাহীন তৃপ্তির মধুর স্পর্শ। ওই স্পর্শে বুকে এনে দেয় অপার শান্তি, অফুরন্ত আনন্দ।

স্বামীর পথ পানে চেয়ে পেতাঙ্গী চাকমা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অরিন্দমের কথা নিয়ে ভাবছে। ছেলেটি বিদ্বান, বুদ্ধিমান আর সাহসী। ওর মতন ছেলে দশ গায়ে খুঁজলেও মেলা ভার।

শোনা যায় নেশা করে না অরিন্দম। বাপের অনেক সম্পত্তি। জায়গা জমি প্রচুর। এ ছাড়া ওর বাবা হেডমাস্টার। অরিন্দম ইচ্ছে করলে নেশা করে জীবনটা ভাসিয়ে দিতে পারে, যা সব চাকমারা করে। পেতাঙ্গী জানে চাকমাদের প্রতি ঘরে জোগরা (মদ) তৈরী হয়। জোগরা পানে ওদের কোন পরিমাণ নেই, যত ইচ্ছে পান করে। এদের জোগরার তৃষ্ণা এত বেশী যে, ভাত খাওয়ার কথা চিন্তা অপেক্ষা জোগরা তৈরী করার আগ্রহ বেশী। ওরা সঞ্চয় জানে না। ভবিষ্যৎ শব্দের তথ্যগত অর্থ ঠিক অনুধাবন করতে পারে না ওরা।

পেতাঙ্গী আরও জানে যতোদিন চাকমাদের ঘরে ধান আছে ততদিন ওদের জোগরার পাত্র খালি থাকে না। দু'তিনদিনের

পরিশ্রমের বিনিময়ে ওরা যা রোজগার করে, পাঁচ-ছজন একত্রে তা এক বৈধকে (বৈঠকে) উড়িয়ে দেয়।

ছোট-বড় বৈঠক ওদের হামেশাই হয়। সারা বছর কাজ করে যা রোজগার করে, তার অর্ধেক সুরা রাক্ষসীকে তুষ্ট করতে তারা খরচ করে। পেতাঙ্গী জানে এভাবে বহু চাকমা ফতুর হয়ে গেছে।

পেতাঙ্গী বহুদিন দেখেছে ওরা মাঝে মধ্যে জোগরা পান করে অজ্ঞান হয়ে যায়। অনেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে গাঁয়ের মাতব্বরদের বিচার—আচার হরদম করতে হয়। একবার ও দেখেছে একপক্ষ মাতব্বরদের বিচারে সন্তুষ্ট না হয়ে সদরে গিয়ে মামলা ঠুকে দিয়েছে। ও আরেকবার দেখেছে এক মরদ মাত্রাতিরিক্ত জোগরা পান করে স্ত্রী-কন্যার উপর অকথ্য অত্যাচার করে সুখের সংসার নরকে রূপান্তরিত করেছে।

পেতাঙ্গী জানে বিবাহ-উৎসবে চাকমাদের জোগরার ব্যবহার করতেই হয়। তখন তাদের জোগরা খেতে কেউ বাধা দিতে পারে না। অতিরিক্ত জোগরা খেয়ে বেহুঁস হয়ে যায়। ওই কথা ভাবলে ওর গা শিউরে উঠে। ও আরও জানে এরূপ অপব্যয়ে চাকমা জুমিয়াদের পরের বছরের বীজি (বীজ) ঘরে থাকে না। তখন ওদের গাঁয়ের সুদখোরদের হাতে-পায়ে ধরা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে পেতাঙ্গী চাকমা আঁতকে ওঠে।

এমন সময় লম্বাছিরা চাকমা পিছন থেকে পেতাঙ্গীকে আদর করছে, সোহাগ করছে।

পেতাঙ্গী হঠাৎ চমকে উঠে। ও বলে, 'কে ?'

জড়িয়ে জড়িয়ে লম্বাছিরা বলে, 'আমি তোমার হৃদয়েশ্বর গো। আমায় চিনতে পারছো না ?'

লম্বাছিরার কথাগুলো মুখে বাঁধছিল। পা দুটো টলমল

করছিল।

এতোক্ষণ বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা ভাবছিল, ওই ভূত আজ নিজের ঘরেই ঢুকেছে। এতোদিন ঘুরায়ে—ঘুরায়ে আজ অভিরাম বড়ুয়া ত্রিশ টাকা দিয়েছে। কিন্তু পাওনা হয়েছিল পঞ্চাশ টাকা। বাকী টাকা নাকি পরে দেবে।

এতোগুলো টাকা হাতে পেয়ে লম্বাছিরা লোভ সামলাতে পারেনি। ঢুকেছে হরিদাসী চাকমার বাড়ি। জোগরা গিলে একটু স্ফূর্তি করে এসেছে লম্বাছিরা।

পেতাঙ্গীর মুখ মেঘলা আকাশের মতন অন্ধকার হয়ে গেছে। ভীষণ ক্ষেপে গেছে ও। ওর মাথা ঘুরছিল, শরীর কাঁপছিল। সামনের লোকগুলোর এক একটি মুখ ওর মনে হলো অস্পষ্ট—ঝাপসা—অচেনা।

ঘরে চাল—ডাল নেই। সব কিছুই বাড়ন্ত। আর ওদিকে স্বামী গিলে এসেছে পচানী জোগরা।

পেতাঙ্গীকে রাক্ষুসীর মতো দেখাচ্ছিল। বাতাসে উড়ছিল তেল বিহীন চুলরাশি। ও রাগে—ক্ষোভে লম্বাছিরা চাকমার গালে একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পর বসিয়ে দেয়। দুহাতে পিঠে কয়েকটা কিল মেরে ঠেলা দেয় লম্বাছিরাকে। জোগরার নেশাতে স্বামী বেচারা তাল সামলাতে পারেনি, তাই বড় অসহায় ভঙ্গিতে মাটিতে পড়ে যায় ও।

মাটি থেকে উঠে হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে লম্বাছিরা। কেঁদে কেঁদে স্ত্রীর কাছে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'মারো' আরও মারো। মারতে—মারতে আমায় শেষ করে দাও।' বলতে বলতে ও মাটিতে বসে পড়ে।

লম্বাছিরা দাঁড়াতে পারছিলো না। ওর পা দুটো টলছিল। পা এক জায়গায় রাখতে পারছিলো না। তাই বসে ও যেন একটু সোয়াস্তি পায়। তার মন খুব ভারাক্রান্ত। উপরন্তু সবিশেষ যন্ত্রণা কাতর।

বসে বসে লম্বাছিরা কাঁদতে থাকে। দু'চোখে ঝর—ঝর করে জল

গড়িয়ে পড়ে দুগাল বেয়ে। কান্নার যেন বিরাম নেই।

চেঁচামেচি আর চিৎকার শুনে অরিন্দম আর বান্ধবী দৌড়ে এলো।

অরন্দিম মাসীকে টেনে একটু দূরে সরিয়ে দেয়। তারপর ধীর গলা[illegible], 'কেন এসব ছাইভস্ম খান মেসো?'

লম্বাছিরা চুপচাপ। কিছুক্ষণ উদাসভাবে চেয়ে থাকে অরিন্দমের দিকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'দেখ অরিন্দম, ওইসব অনেক কথা। তুমি বুঝবে না।

অরিন্দম গম্ভীর গলায় বলে, 'আমি কি কচি খোকা যে বুঝব না। কেন খান, বলেন তো মেসো?'

ভারাক্রান্ত কণ্ঠে লম্বাছিরা বলে, 'বড় দুঃখে খাই অরিন্দম, বড় দুঃখে খেয়েছি। আমার অনেক দুঃখ!'

ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অরিন্দম প্রশ্ন করে, 'কি দুঃখ মেসো?'

ব্যথিত কণ্ঠে লম্বাছিরা বলতে থাকে 'জন্ম থেকে বড় দুঃখ-কষ্টে আজ এতো বড় হয়েছি। ছেলে আছে, মেয়ে আছে। তাদের কোনদিন ভাল খাওয়াতে পারিনি, ভাল কিছু পরাতে পারিনি। তনিয়ার মাকে ভাল মন্দ কিছু দিতে পারিনি। ছেলে-মেয়ের স্বাদ আহ্লাদের কোন জিনিস আনতে পারিনি। ওদের দুঃখে কষ্টে কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। তাই আজ যখন এতগুলো টাকা একত্রে হাতে পেলাম তখন মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। ইচ্ছে হলো একটু জোগরা খাই। সব ভুলে থাকি কিছুক্ষণের জন্যে। হঠাৎ বান্ধবী-তনিয়ার মুখগুলো ভেসে এলো চোখের সামনে। অস্থিচর্মসার তনিয়ার মার মুখখানাও ফুটে উঠলো। তাদের সবার কথা ভাবলাম খানিকক্ষণ। ওরা উপোস থাকবে। না খাব না।'

'তারপর মোসো?'

'যখন হরিদাসী চাকমার বাড়ির কাছ দিয়ে আসছি, তখন আর লোভ সামলাতে পারিনি। টেঁকে টাকা থাকলে কোন চাকমাই

পারে না।,

'কি করলেন?'

'হরিদাসীর বাড়িতে ঢুকলাম। ওর বাড়িতে একটা ভাঙা জঙ ধরা আনা (আরশি) ছিল। ওই আনাতে নিজের মুখখানা দেখে একটু রাঙা হবার সাধ জাগলো। তাই পাঁচ টাকার নোট দিয়ে দু [illegible]ল জোগরা কিনে চলে গেলাম মানিকপুর গাঁয়ের ওই বড় টিলার উপর। খুব নির্জন জায়গা। তারপর একটা গাছে হেলান দিয়ে নিজের অতীত জীবনের কথা ভাবতে-ভাবতে নিঃশেষ করলাম বোতল দুটো। একথা বলে লম্বাছিরা নিজের কাপড়ের খুঁটে বাঁধা পঁচিশ টাকা বের করে তনিয়ার মার দিকে ছুঁড়ে দিলো।

স্বামীর কথা শুনে পেতাঙ্গীর চোখ ছলছল করতে থাকে। নিচের দাঁত দিয়ে ওপরের ঠোঁটটাকে জোরে কামড়ে ধরলো। নিঃশব্দে কাঁদতে থাকলো অনেকক্ষণ। পাছে মুখ ফুটে শব্দ বেরোয় তাই সাবধানে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। আব যে হাতে স্বামীকে থাপ্পর-কিল মেরেছিল ওই হাত দুটোকে জোরে কামড়ে দেয়।

কিছুক্ষণ পব দেখা গেল পেতাঙ্গীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। ওই অশ্রুর বুঝি বিরাম নেই।

ওদিকে বান্ধবীর চোখ দুটোও জলে ভরে গেছে। ও বসে পড়ে মাটিতে। মুখে পাছড়া গুঁজে ফুঁপিয়ে—ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

এদিকে অরিন্দমের চোখদুটো অশ্রুভারে চিকচিক করতে লাগলো। সমব্যথী হয়ে আনমনে তাকিয়ে থাকে দুঃখে-শোকে ভারাক্রান্ত পাহাড়ী পরিবারটির দিকে।

— — —

॥ তের ॥

[redacted] খবর এসেছে আমি বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেছি। খবরটা পেয়ে কত যে আনন্দ হলো তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আজ যদি মা থাকতেন কত যে খুশি হতেন উনি।

স্কুল থেকে ফেরার পথে ডাকহরকরা চিঠিটা দিয়েছে। চিঠিটা লিখেছে আগরতলার এক বন্ধু। চিঠি যখন পাই তখন হেডমাস্টারবাবু আমার সঙ্গে ছিলেন। শুনে উনিও খুব খুশি হয়েছেন।

হেডমাস্টারবাবু আমায় বললেন, 'আপনি বাসায় চলে যান আমি ভগবানবাবুকে সুখবরটা দিয়ে আসি। আপনার এ কৃতিত্বের জন্য স্কুলের তরফ থেকে আপনাকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা করে যাই। নিজে তো পারলাম না। আপনি একটার পর একটা পাশ করে যাচ্ছেন, এর জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানানো আমাদের কর্তব্য।

হেডমাস্টারবাবুর কথার উত্তরে কিছুই বলতে পারলাম না। শুধু মাথা নিচু করে ওঁর কথাটাকে স্বাগত জানালাম। বললাম, 'আমারও তো সেক্রেটারীবাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার।'

হেডমাস্টারবাবু বললেন, 'না, আপনার যাবার দরকার নেই। বিকেলে ওঁকে নিয়ে আপনার বাসায় যাব।' এ কথা বলে তিনি দেওয়ান বাড়ির দিকে রওনা দিলেন।

আমার এ সাফল্যে প্রথমে মা'র কথা মনে পড়ে। তিনি খুব খুশি হতেন। কিন্তু উনি তো আর ইহ জগতে নেই। এখন মা'র মতন যত্ন করে একমাত্র গোমতী। তাই ওর কথা মনে পড়ে।

গোমতীর জন্য কিছু কাপড়-চোপড় নেয়া যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছামনু বাজারে গিয়ে ওর জন্যে ভাল দেখে

একটা শাড়ী, একটা ব্লাউজ আর একটি বক্ষ-আবরণী কিনে নিলাম।

ডেরায় পৌঁছতেই গোমতী অভিভাবকসুলভ সুরে বললো, 'এতক্ষণে এলেন ?'

বললাম, 'আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে গোমতী। আ[illegible] ক্ষমা করে দে।'

গোমতী খুব লজ্জা পেয়ে গেল। ও রাগের সঙ্গে বললো, 'ছিঃ ছিঃ, একি বলছেন। আপনার সঙ্গে কথাই বলবো না আর।'

হাতের প্যাকেটটা দেখিয়ে বললাম, 'বলতো এতে কি আছে ?'

'ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষার খাতা আর কি ?'

'হলো না।'

ঝটকা দিয়ে আমার হাত থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয় গোমতী। তারপর ওটার একটা কোণ ছিঁড়ে দেখে বলে, 'কাপড় ! আপনার জন্যে কি কাপড় আনলেন ?'

'দূর পাগল, আমি কি কাপড় পরি। আমি তো প্যাণ্ট পরি। তোর কোন আক্কেল নেই।'

'তাহলে বিছানার চাদর এনেছেন। কিন্তু বিছানার চাদর তো দুটো ট্রাঙ্কে আছে। আপনি শুধু-শুধু টাকা-পয়সা খরচ করেন।'

'দূর বোকা তোর একটুও বুদ্ধি নেই।'

'তাহলে আমার জন্যে কিছু এনেছেন। দেখি দেখি।' বলে প্যাকেটটা খুলে নেয় গোমতী। শাড়ী, ব্লাউজ, বক্ষ-বন্ধনী দেখে ওর মুখ খুশির মৌতাতে ঝলমল করে ওঠে। আনন্দের স্বরে ও বলে উঠলো, 'আমার জন্যে হঠাৎ এত খরচ করতে গেলেন কেন ? আমার তো ওগুলো আছে।'

ওর চিবুকটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, 'ও পোড়ারমুখী, মার অবর্তমানে তুই-ইতো মার মতন আদর করিস। মার অভাব তো তোকে নিয়েই ভুলে থাকি।'

কেউ দেখে ফেলে কিনা তাই ও দরজাটা বন্ধ করে দিলো। আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। হঠাৎ ও আমায় গড় হয়ে প্রণাম করে। আমি ওকে 'দীর্ঘায়ু হও' বলে আশীর্বাদ করলাম।

আশীর্বাদান্তে বললাম, 'গোমতী, একটা সুখবর আছে।'

[illegible] কথা শুনে ও শশব্যস্ত হয়ে বলে, 'কি সুখবর? এতোক্ষণে বলতে হয়।'

'সুখবর হলো আমি বি. এ. পাশ করেছি।'

গোমতী আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। খুশিতে ওর চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

গোমতী আবার আলুলায়িত কেশদাম লুটিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে আমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করলো।

ওকে শুধালাম, 'ও-বাঁদরী, আবার কি আশীর্বাদ চাস্। এখনি তো আশীর্বাদ করলাম।'

নত মস্তকে আমার পায়ের উপর পড়ে রইলো। অনুকম্পার হাসি হেসে ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, 'যা আশীর্বাদ করলাম, তোর জামেয়্যা (বিয়ে) যেন কোন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে হয়। তোর জামেয়্যার জন্য আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।'

গোমতী কিছুক্ষণ নিথর দৃষ্টি দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আনত চোখ, নত মুখে দাঁত দিয়ে লাল গোলাপী ঠোঁটটা কামড়ে ধরে ধীরে ধীরে চলে গেল।

ডাকলাম, 'ওই গোমতী শোন।' ধীরপদে ও এল, দেখলাম ওর চোখগুলো চক্ চক্ করছে। বললাম, 'আমার দিকে তাকিয়ে দেখতো?'

গোমতী মাথা ওঠাতে পারছিলো না। যখন হাত দিয়ে জোর করে ওর মাথাটা উঠালাম, দেখলাম ওর দু'চোখ বেয়ে দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। ওর মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। দেখলাম তার চোখ-মুখ ব্যথায়-কাতর।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি কি তোর মনে কোন আঘাত দিয়েছি রে ?'

গোমতী আবার দরজা বন্ধ করে দিল। আমি চৌকির উপর বসে আছি। ও মাটিতে বসে আমার কোলের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ওই কান্নার বিরাম নেই। [illegible]বিরাম কেঁদে চলেছে।

আবার ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছেরে গোমতী ?

এবার গোমতী মুখ তুলে বললো, 'জীবনে বহু দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু এমন সোহাগ কেউ কোনদিন করেনি।' খুশির আবেগে ও আতিশয্যে ওর দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

তখন বুঝলাম, 'আনন্দাশ্রু'।

গোমতীর মনে পরিবর্তন আনতে বললাম. 'কাঁদলেই চলবে ? আমার যে খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দে।'

এবার ও লজ্জা পেয়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ভাত দিতে দৌড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। ফিরে দেখে আমি তখনও বসে আছি। এ ছাড়া আমি চানও করিনি।

তখন গোমতী সম্বিৎ ফিরে পায়। ওর লাল গোলাপী ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

গোমতী বলে, 'আমাকে তাড়া দিলে কি হবে। এখনও যে চানও সারা হয়নি।'

আমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে গোমতী ভাত নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

গোমতী চলে যাবার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকি ওর গমন পথের দিকে। ওর সম্বন্ধে ভাবি অনেক কিছু। কিন্তু ভেবে-ভেবে কোন কূল কিনারা পাই না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন দেখি গোমতী ঘর-দোর ঝাড়-পোঁছ করছে।

বিছানায় বসে বসে যখন চা খাচ্ছি এমন সময় ঘরে ঢুকলেন নরহরি দত্ত। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। এই অঞ্চলের বাঙালীদের মধ্যে উনি হলেন আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ।

নরহরিবাবু ট্রাইবাল এক্সটেনশন অফিসার। তাঁর আফিস ছে[illegible]য়। ছামনু থেকে আট কিলোমিটার দূরে।

নরহরিবাব বি. এ. পাশ। তিনি বি. এ. পাশ করেছেন চার বছর আগে। তিনিই আমাকে বি. এ. পরীক্ষার জন্য সমস্ত বইপত্র দিয়েছেন। আর দিয়েছেন সিলেবাস এবং কানে কানে বলেছেন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পাশ করার কৌশল। কৌশল হলো নির্বাচিত প্রশ্ন ধরে খুব ভাল করে পড়ে যাওয়া। উনি আরও শিখিয়েছেন কি করে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নামক মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাতে হয়।

নরহরিবাবু ঘরে ঢুকেই বললেন, 'কংগ্রাচুলেশন।'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আমি আশা করিনি তিনি আমার এখানে আজ আসবেন। উনি আমার ডেরাতে বহুবার এসে আমার পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে গেছেন। ভাবছি, তিনি কেমন করে আমার সাফল্যের খবর পেয়ে গেলেন আজই!

বিছানা থেকে উঠে নরহরিদার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি দুপা পিছিয়ে গিয়ে বলেন, 'আরে, করো কি—করো কি!'

বিনম্র কণ্ঠে বললাম 'নরহরিদা, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার দয়াতেই আমি বি. এ. পরীক্ষায় উৎরাতে পেরেছি। নতুবা এ গণ্ডগ্রাম থেকে বি. এ. পাশ করা চাট্টিখানি কথা নয়।'

নরহরিদা সহজ গলায় বললেন, 'আমি তো উপলক্ষ মাত্র। তুমিই তো ধৈর্যের সঙ্গে পড়াশোনা করে পাশ করলে।'

'আপনি আজই কেমন করে জানলেন আমি পাশ করেছি?'

'আমাদের ওখানে একটি মেয়েও প্রাইভেট পরিক্ষার্থী হিসাবে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল। ও পাশের খবর আজ পেয়েছে। তাই

মনে করলাম তোমার খবরটাও আসতে পারে। তাই ছুটে এলাম।'

'তারপর, নরহরিদা?'

'ছামনু বাজারে এসে তোমাদের স্কুলের হেডমাস্টারবাবুর সঙ্গে দেখা। ওঁকে তোমার পাশের খবর জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন তুমি পাশ করেছ। তাই দৌড়াতে-দৌড়াতে চলে এলাম তোমার অমর পুরীতে।'

খুশি খুশি মুখে নরহরিদার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি।

আনন্দে গদ গদ হয়ে নরহরিদা বলেন, 'আমি আগেই জানি তুমি পাশ করবেই। এত খাটুনি কি বিফলে যাবে। তাই মেয়েটার খবর আসতে আমি নিঃসন্দেহ হয়েই তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এ আট কিলোমিটার পথ ছুটে এসেছি।'

বাইরের দিকে চেয়ে নরহরিদা বলেন, 'ঐ, সেক্রোটারীবাবু আর হেডমাস্টার মশায় তোমার ভাষায়, তোমার ডেরাতে আসছেন।'

নরহরিদা আমায় জিজ্ঞেস করেন, 'পাশের খবর পেয়ে কেমন লাগছে বিমল?

নরহরিদার কথা শুনে আমার মুখে স্মিতহাসি ফুটে উঠল। কিন্তু নরহরিদার কথার উত্তর দেবার সুযোগ পেলাম না। এমনি সময়ে হেডমাস্টার মশায়কে নিয়ে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সেক্রেটারীবাবু ডেরায় ঢুকলেন।

হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে সেক্রেটারী মশায় আমাকে বলেন, 'কংগ্রাচুলেশন মাস্টারবাবু'। আপনি আমাদের স্কুলের গৌরব বৃদ্ধি করলেন। আপনার জন্য আমাদের স্কুল গর্বিত।'

বললাম, 'শুনেছি ছাত্র-ছাত্রী পাশ করলে স্কুল গর্ব অনুভব করে। কিন্তু শিক্ষক পাশ করাতে কেমন করে স্কুল গর্বিত হলো।'

'আমাদের স্কুলতো আর পাব্লিক এগ্‌জামিনেশন দেবে না যে তার নাম হবে।'

'বৃত্তি পরীক্ষাতে আপনার স্কুলের ছাত্রছাত্রী পাঠান না কেন? পঞ্চম শ্রেণী পাশ করলেই তো বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।'

হেড মাস্টারবাবু আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি যদি ভার নেন তাহলে আগামীবার থেকে আমরা বৃত্তি পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রী পাঠাব। দুটো ছাত্র এবার বেশ ভাল আছে। অভিভাবকেরা যদি তাদের পড়াশোনার ব্যাপারে দৃষ্টি দেন, তাহলে আমি কথা দিতে পারি ভবিষ্যতে ওরা ভাল ফল করবেই।'

সোৎসাহে আমি বললাম, 'ভার নিলাম।'

সেক্রেটারীবাবু আমাকে বলেন, 'আপনি তো পাশ করলেন, এবার ভাল চাকরী পেয়ে আমাদের ছেড়ে যাবেন না তো?'

নরহরিদা বলেন 'বিমলবাবু বি, এ, পাশ করে জুনিয়র বেসিক স্কুলে পড়ে থাকবেন কেন?'

সেক্রেটারীবাবু বললেন, 'তা তো নিশ্চয়ই।'

এ কথা বলে তিনি কি যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর বলেন 'বিমলবাবু আমাদের স্কুলে আসাতে পড়াশোনার ব্যাপারে এই অঞ্চলে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। দেখি দরবার করে স্কুলটাকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে রূপান্তরিত করা যায় কিনা?'

হেডমাস্টার মশায় বলেন, 'বিমলবাবুর মতন শিক্ষক পেলে তিনজন মাস্টারের কাজ একজনকে দিয়ে চালানো যায়। আমাদের দরবারে তো সরকার আরেকজন শিক্ষক দিলেন। তিনি তো স্কুলটাকে নিজের মতো করে দেখলেন না। কেবল আগরতলা, ছামনু করতে-করতেই হন্যে হয়ে যান, ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভাববার ফুরসুৎ কোথায়?'

সেক্রেটারীবাবু বলেন, 'বিমলবাবু স্কুলটাকে যেভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন, ওই রকম নিজের করে কজন শিক্ষকমশায় করেন!'

নরহরিদা বলেন, 'অনেক অভিভাবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। ওঁরা বিমলবাবুর শিক্ষকপনায় আর মিষ্টি ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট।'

আমি কোন সুযোগই পাচ্ছি না, কার কথার জবাব দেব। আমাকে সবাই যেভাবে গ্যাস দিচ্ছে কখন যে বার্স্ট হয়ে যাব কে জানে।

সেক্রেটারীবাবু আসার সময় কিছু মিষ্টি এনেছিলেন। ওই মিষ্টি দিয়ে সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিলাম।

এখনও বিকেল ফুরোয় নি, ফুরিয়ে আসছিল। রোদ নেই। আকাশ পরিষ্কার।

সবাই একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন!

॥ চৌদ্দ ॥

ফাল্গুন মাস।

কিছুদিন আগে লংতরাই পাহাড়ের উপর মূলী বাঁশের টুকরো পুঁতে-পুঁতে ক্ষেত্রীছড়া, ঝালছড়া, ভাইবোনছড়া, ডেভাছড়া, মালিধর রাজধর ও ছেলাগাঙছড়া ইত্যাদি গ্রামের জুমিয়ারা জুমক্ষেতের ধুঝি (সীমানা) ঠিক করে গেছে।

লোকসংখ্যা বেড়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে জুমের পরিসর ছোট হয়ে গেছে, তাই জুমক্ষেতের ধুঝি নিয়ে চাকমাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকে। তাই বিভিন্ন গাঁয়ের মাতব্বরেরা মিলে-মিশে গ্রামবাসীদের ঝগড়া মিটিয়ে যার যার জমির ধুঝি ঠিক করে দিয়েছে।

কয়েকদিন আগে ক্ষেতের উপরের বিভিন্ন গাছ-গাছালি কেটে গেছে চাকমা জুমিয়ারা যাতে আগুন দেয়া যায়। ওইগুলো যেন শুকিয়ে জ্বালাবার উপযুক্ত হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট দিনে সবাই এসে জুম ক্ষেতে আগুন দেবে।

চান করে পবিত্র দেহে সব চাকমারা এসেছে জুম ক্ষেতে আগুন দিতে। জুম দেবতার পুজো দিয়ে এসেছে সবাই। একত্রে জুম ক্ষেতে

আগুন দিতে হয়, এটাই নিয়ম।

হেডমাস্টারবাবু, দেওয়ানবাবু আরও কয়েকজন জুমিয়া চাকমা আমাকে অনুরোধ করেছেন তাদেব জুমে আগুন দেয়া, জুম রোপণ, আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদি দৃশ্যগুলো যেন দেখি। ওঁরা সবাই জানেন আমি পাহাড়ীদের জীবন প্রণালী জানার জন্য বিশেষ উৎসুক। ওই কথা মনে রেখে ওঁরা আমাকে সময় মতন জানালেন। ওঁরা আমাকে আরও বলেছেন জুম পাহারার গীতিদ্বন্দ্ব যেন অবশ্যই শুনি। ঐ সব গান শুনতে খুবই ভাল লাগবে। তাই জুমের আগুন দেয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি অনুষ্ঠানে যাবার জন্য তৈরী আমি।

শীতের দিনের জ্বালাহীন রোদ। খুব ভালই লাগছিল মিষ্টি মিষ্টি সোনালী রোদটুকু। সবাই নেমে গেছে জুম ক্ষেতে কাঠের লুরো (মশাল) হাতে।

জমির দিকে দিকে আগুন জ্বলে উঠল। কেটে নেয়া বিভিন্ন ফসলের শস্যহীন অংশগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে উন্মুখ হয়েছিল। কাঁটা গাছগুলোও শুকিয়ে জ্বালাবার জন্য তৈরী। লুরোর স্পর্শে ওইগুলো দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

ওটা এক চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয় জুমক্ষেতে এ ভর দুপুরে গাঁয়ে মহামারীর পর হাজার-হাজার চিতাশয্যা রচিত হয়েছে।

উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে লিকলিকে আগুনের লেলিহান শিখা আর রাশি-রাশি ধুঁয়া। সুরেলা কণ্ঠে চাকমারা আনন্দে মাতোয়ারা। তাদের আনন্দের কলতানে দশদিক মুখরিত।

এক সময় জুমক্ষেতগুলো কালো হয়ে গেছে। পুড়ে যাওয়া অংশ-গুলোর ছাই বাতাসে উড়ে এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে।

কিছুদিন পর চাকমাদের গাঙ পূজো। গাঙ পূজো বলতে গঙ্গা পূজাকে বুঝায়। কিন্তু আসলে ওটা হলো চাকমাদের শস্য দেবতার পূজো। কেননা জুম-অর্জিত ফসল ভাল হবার জন্যই এই গাঙ

পূজোর আয়োজন করেছে ওরা। এ পূজো হলো চাকমাদের সর্বজনীন পূজো।

ছামনুনদীর তীরে চাকমারা পূজোর বেদী তৈরী করেছে। বেদীর পাশে বানিয়েছে ধান, কার্পাস, পাট, তিল, মরিচ ইত্যাদির প্রতিকৃতি।

পূজো দিতে অজা (গ্রামের পুরোহিত) এসেছেন। শুচি শুদ্ধ-চিত্তে পূজো দেবার পর অজা একটি শূকর, পাঁচটি মোরগ এবং সাতটি কবুতর উৎসর্গ করেছেন জুম দেবতার নামে।

পূজো শেষ হবার পর সবাই জুম দেবতার কাছে জুম ফসলের মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা জানাচ্ছে। গড় হয়ে প্রণাম করছে সবাই।

আরও কিছুদিন পরের কথা।

গত কয়েকদিন ধরে কিছু কিছু বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন জুম রোপণ করার পালা।

একটা ভাল দিন দেখে সবাই চলেছে জুম রোপণ করতে। খুব ভোরে গাধানা (স্নান) করে নিয়েছে সবাই। অস্নাত কেউ যেতে পারে না জুম রোপণ করতে। শুদ্ধ দেহে যেতে হয় জুমক্ষেতে।

যাদের জুমক্ষেত আছে তারা তো যাচ্ছেই আর যাদের জুমক্ষেত নেই ওরাও যাচ্ছে জুমিয়াদের সাহায্য করতে।

ধান, কার্পাস, পাট, তিল এবং বিভিন্ন সবজি ও ফল-ফলাদির বীজ একত্রে মিশিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে আরও মিশিয়েছে মাটি ও জল। তারপর বীজগুলো বিভিন্ন কাল্যংতে (ঝুড়িতে) ভাগ করে নিয়েছে। সবাই কাল্যং কাঁধে বেঁধে নেয়। আর হাতে নেয় এক-একটা তাগল (দা)। পরপর লাইন বেধে ওরা চলেছে জুমক্ষেতে।

যথা সময়ে সারি করে সবাই এগিয়ে যায় বীজ রোপণ করতে। কি অপূর্ব দৃশ্য। কি সুন্দর শৃঙ্খলা বোধ ওদের।

দলের প্রত্যেকে ডান হাতে ট্যারা করে তাগল দিয়ে একটা কোপ

দেয় আর বাঁ হাতে পরিমিত বীজ পুরে দেয় গর্তে। এমনিভাবে চাকমা জুমিয়ারা জুম চাষ করে চলেছে।

জুম রোপণের সময় ছেলের দল গান গেয়ে যায় আর মেয়ের দল ওই গানের উত্তর দেয়। আজও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

তাই আজ চাকমা যুবক যুবতীদের মনমাতানো বিভিন্ন গানে লংতরাই পাহাড়ের কিছু অংশ নিনাদিত—ঝংকৃত, উদ্বেলিত। সুরের লহরী পাহাড়ের গায়ে বাধা পেয়ে অশেষ ব্যঞ্জনায় উচ্ছ্বসিত।

গানের সঙ্গে সঙ্গে বীজ বোনা চলেছে। এ গানের চেতনায় চাকমারা এক নব চেতনা লাভ করেছে। যে বীজ রোপণ পাঁচ ঘণ্টায় শেষ হবার কথা ঐ কাজটা শেষ হয়েছে তিন ঘণ্টায়।

আরও কিছুদিন পরের কথা।

চাকমা জুমিয়ারা এখন ভারী ব্যস্ত। ওদের ফুরসৎ নেই। গাছ-গাছালি—জঙ্গলে জুমক্ষেত ভরে গেছে। ওরা যার যার তাগল দিয়ে জুমক্ষেত পরিষ্কারে তৎপর। কয়েকদিনে জুমক্ষেত ছাপ-ছোপ হয়ে গেছে।

এবার জুম পাহারা দিতে হবে। পাহারা না দিলে বুনো পশু-পক্ষীরা জুমের ফসল খেয়ে ফেলবে। বুনো হাতি, হরিণ, বানর ইত্যাদি জানোয়ারেরা জুম ফসলের মহাশত্রু।

চাকমা জুমিয়ারা জুমক্ষেতে বাঁশের উপর মাজা (মাচান) করে মোনঘর (টংঘর) তৈরী করেছে। সামনে আছে ছোট্ট সিংগবা (বারান্দা)। পাঁচ ছয় হাত উঁচুতে সম্পূর্ণ বাঁশের দ্বারা তৈরী করেছে মোনঘর আর সিংগবা।

টিন পিটে, নানান বাদ্য যন্ত্র বাজিয়ে, পটকা ফাটিয়ে বুনো জন্তু-জানোয়ারদের তাড়াতে হয়। পাখিরাও জুমক্ষেতের ফসল খেতে আসে। তাদের তাড়াতে হয় বাঁশের এক প্রকার কল দিয়ে।

জোৎস্না প্লাবিত রাত।

চাঁদের রূপালী জাল বিস্তৃত হয়ে সমগ্র অঞ্চলটিকে স্বপ্নপুরী

করে তুলেছে।

জুম পাহারার কাজ নিতান্ত এক ঘেয়ে। ভিন্ন ভিন্ন মোনঘর থেকে যুবক-যুবতীদের মধুর সরস গীতিদ্বন্দ্বে নিস্তব্ধ বনভূমি মুখরিত।

গীতগুলো খুবই ভাবপ্রবণ। একঘেয়ে কাজকে করে তুলে আনন্দ-মুখর। উদ্দীপনায় হারিয়ে ফেলে ওরা একঘেয়েমির ক্লান্তি।

জুমের গানের মাধ্যমেই যুবক-যুবতীদের মন দেয়া-নেয়ার শুভ সূচনা। তখন থেকেই ভবিষ্যতের সুখময় দাম্পত্য জীবনের স্বপ্নময় পটভূমি রচনা করে চাকমা জোয়ান-জোয়ানীরা।

জুম পাহারার কাজ চলছে। অপূর্ব সুরেলা গান ভেসে আসছে বিভিন্ন মোনঘর থেকে। গ্রামের সবাই উৎসুক। রাত জেগে-জেগে সবাই গান শুনছে।

পাশাপাশি দুটি মোনঘরে বান্ধবী আর অরিন্দমের লাঙ্যা-লাঙনী গীতে (গীতিদ্বন্দ্বে) সমস্ত পাহাড় মধুর রসঘন হয়ে উঠেছে। তাদের গানে সমস্ত আকাশ-বাতাস নিনাদিত।

গান চলেছে :

অরিন্দম—চিগন ছরা চিগন চেই,
খুঁজি ডাঙগর চিগন্ বেই।
ছরাছরি বিল হবো,
তোর হাতর পান খিলি ঈল হবো।

[ছোট ছড়াতে ছোট চেই (মাছ ধরার ফাঁদ) পাতা হয়েছে। আমার ছোট প্রাণসখি তোমাকে খুঁজে বেড়াই চেই পেতে। অনেক ছড়া এক স্থানে মিলিত হয়ে যেমন বিলের সৃষ্টি করে, লোকের চোখ জুড়ানো দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটায়, তোমার হাতের পানের খিলি খেয়েও আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলে একাকার হয়ে যাবে।]

বান্ধবী— ঈজর মাদাৎ বই চান চাগে,
খাদি মেলি দিয়ম পান খাগে।

[উঠোনে বসে চাঁদ দেখতে অপরূপ লাগে। ওহে প্রাণসখা তুমি

এসো ওই দৃশ্য দেখতে। তাই তোমায় পানের নিমন্ত্রণ করলাম)

অরিন্দম— ধুন্দা বাজেই 'ত' দিবে,

এদক মাগিলুম ন দিলে।

(তামাক সাজতে কল্কির ছিদ্র বন্ধ করতে ইঁটের টুকরোর দরকার। ইহা তামাকের স্বাদ না বাড়ালেও তামাক খেতে সাহায্য করে অশেষ। 'ত'-এর মতন আমি এতো যে অগ্নিদগ্ধ হই তবুও দিলে না তোমার মন্)

বান্ধবী— শিলর কাঙারা কলেধর,

পরাণে মাগিলে বলে ধর।

(পাথরের ফাঁকে কাঁকড়া লুকিয়ে থাকে। ওইগুলো ধরতে কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। তোমার যদি কৌশলের অভাব হয় তাহলে শক্তি প্রয়োগ করে দেখ।)

অরিন্দম— শিলর কাঙারা ডর গরে,

বলে ধর্তু'ম লাজ গরে।

(কৌশলে ধরা ভয়ের অধিক জানো, শক্তিতে ধরা লজ্জার অধিক জানো।)

বান্ধবী— মইন ঘরৎ খের ঝারি,

মুই থেইম বেরা ঘাজি।

(টংঘরে খড় থেকে ধান ঝেড়ে যে দিকে ফেলে দেয়া হয়, ঐ দিকে বেড়ার পাশে আমাকে তুমি পাবে।)

অরিন্দম— বেইল্যা নিগল্যে তিতি পেইক,

থবাক বাজ্যেম বই নিচ্ছি রেইৎ।

(রাত নিশিতে যখন ডাকবে তিতি পাখি তখন আমি খুঁটিতে টোকা (আঙুল দ্বারা আঘাত) দিতে থাকব।)

বান্ধবী— খার পাণি মাধাত ঘজিবে,

কধাৎ আগণ ম মা-বাবে।

[খারের জল দিয়ে মাথা পরিষ্কার করার মতন মা-বাবার সম্মতি নিয়ে আমি সত্যি তোমায় আহ্বান জানাচ্ছি।]

অরিন্দম— গাবুরে বানাদন দরজা,
তমাইচু তোলে কিঅ মাল্লে,
বানা তি-ভরজা ?

(আমি তো যাব ভরসা করে তোমার, কেউ যদি না বুঝে মেরে যদি বসে, পারবে তুমি আমায় রক্ষা করতে ?)

বান্ধবী— কেইয়া লগে ছাবাবুঅ,
মাও এলে দিম পিঠ পাদি,
কাপ্প এলে দিম গলাবুঅ।

(যদি মারতে আসে পিঠ পেতে দেব, যদি কাটতে আসে গলা বাড়িয়ে দেব।)

অরিন্দম— যক্‌খে জাগি উদে তিতি পেইক,
ত ইচু এন্বে মুই নিঝিরেত।

(গভীর রাতে তিতি পাখির ডাকার সময়ে, কথা দিলাম আসব আমি।)

॥ পনের ॥

নরহরিদা বলে গেছেন ওঁর কোয়র্টারে, গিয়ে কয়েকদিন বেড়িয়ে আসতে। তাই হেডমাস্টার মশায়ের কাছ থেকে দুদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছি।

এ-দুদিন গোমতীর ছুটি। ডেরা বন্ধ করে ও তার মা-বাবার কাছে থাকবে। ওর খাওয়া-দাওয়ার জন্যে পাঁচটি টাকা দিয়েছি, চাল-ডাল কিনে বাড়িতে যেন খেতে পারে।

আজ স্কুলের ক্লাস সেরে ডেরায় ফিরে এসেছি। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করলাম। তারপর গোমতীকে বিদায় দিয়ে, ডেরাটা ভাল করে বন্ধ করে, নরহরিদার কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে হেঁটে রওনা দিলাম। যাবার সময় গোমতীর বাবাকে বলে গেছি ও যেন আমার ডেরার দিকে নজর রাখে।

গ্রামটি আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। এখানে চোর-ডাকাতের কোন উপদ্রব নেই বললেই চলে। এ ছাড়া আমাকে সবাই শ্রদ্ধা করে, তাই আমার ডেরাতে চুরি হবার ভয় নেই।

শরতের নীল আকাশে সোনালী রোদের মেলা। ফুল ফুটেছে মনুনদীর চরের ঝোপ-ঝাড়ে।

মনুনদীর পার ঘেষে ফুলের শোভা দেখতে দেখতে সন্ধ্যার আগেই নরহরিদার কোয়ার্টারে পৌছলাম। একটু আগে তিনি অফিস থেকে ফিরেছেন। আমাকে দেখে উনি খুব খুশি।

কোয়ার্টারটি ছিমছাম। তিনটি ঘর। বেশ ফিটফাট ও গোছালো।

নরহরিদার স্ত্রী এসে খিল খিল করে মিষ্টি হাসি হেসে আমায় স্বাগত জানালো।

বৌদির মুখের গড়নটি বড় চমৎকার। মুখের ছাঁচ যেন হরতনের টেক্কার মতন। চোখদুটো বেশ ছোট ছোট। মুখে-চোখে ভারী শান্ত ভাব।

নরহরিদার ছেলে-মেয়ে আমার কাছে এলো। ছেলেটির বয়েস সাত বছর আর মেয়েটির বয়েস চার বছর। হৃষ্টপুষ্ট, পরিচ্ছন্ন, নাদুস-নুদুস চেহারা। হাসি-হাসি মুখে ওরা আমায় গড় হয়ে প্রণাম করলো। আদর করে, গালে চুমো খেয়ে তাদের প্রাণভরা আশীর্বাদ করলাম। আসার সময় ওদের জন্যে এনেছিলাম দু' প্যাকেট ব্রিটানিয়া বিস্কুট আর কিছু ফল-ফলাদি। আদর সোহাগ করে ওদের হাতে ওগুলো তুলে দিলাম।

মুখ-হাত ধুয়ে, কিছু জলযোগ করে নরহরিদা আমাকে ছৈলেংটা বাজারটা ঘুরে ফিরে দেখালেন।

পশ্চিম আকাশটা লাল হয়ে গেছে। সূর্য ডুবুডুবু। একটু পরে নেমে আসবে ঘন অন্ধকার।

এগিয়ে গেলাম মনুনদীর পারে। একটা ভাল জায়গা খুঁজে দুজনে ঘনিষ্ট হয়ে নদীর তীরে বসলাম। আমি কয়েকটা ঢিল খুঁজে এলোপাতাড়ি নদীর জলে ছুঁড়লাম। কারও মুখে কোন কথা নেই।

কিছুক্ষণ হল চাঁদ উঠেছে। ষোলকলায় পূর্ণ পূর্নিমার চাঁদ।

হঠাৎ নরহরিদা নীরবতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর বিমল, বি. এ. তো পাশ করলে, এবার এম. এ. পরীক্ষায় বসার কথা ভাবছ কি?'

নরহরিদার প্রশ্নের উত্তরে হতাশ সুরে বললাম, 'ইচ্ছে তো আছে, কিন্তু উপায় কই!'

'কেন?'

'কলকাতা গিয়ে রেগুলার ছাত্র হিসাবে পড়তে তো পারব না। প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে হবে।'

'তা তো নিশ্চয়ই।'

'কে আমাকে নোটস্ দেবে? কে আমাকে বুঝাবে যে এভাবে পড়লে, এ প্রশ্নগুলো তৈরী করলে এম. এ. পরীক্ষা নামক মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারব।'

'যদি আমি তোমার ওই ব্যবস্থা করে দি, তাহলে তোমার মত আছে তো?'

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাথা নতকরে নরহরিদার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললাম, 'বি. এ. পরীক্ষার মতন আপনিই এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দিন। আপনি না থাকেলে এ অজ পাড়াগাঁয়ে থেকে কখনও বি. এ. পাশ করতে পারতাম না।'

নরহরিদা জলদ গম্ভীর গলায় বলেন, 'তোমার সাবজেক্ট হবে পলিটিক্যাল সায়েন্স। তোমার তো কোন অসুবিধে হবে না?'

উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলাম, 'না। আমার কোন অসুবিধে হবে না। আমারও তাই ইচ্ছে। বি. এ. পরীক্ষায় পলিটিক্যাল সায়েন্সে বেশ ভাল নম্বর পেয়েছিলাম। আমার এ সাবজেক্টটা পড়তেও খুবই ভাল লাগে।'

'তাহলে ভালই হলো। আমি আগামী সপ্তাহে আগরতলা যাব। আমার এক বন্ধু গতবার পলিটিক্যাল সায়েন্সে পাশ করেছে। ওর কাছ থেকে সব জেনেশুনে সব বই আর নোটস্ নিয়ে আসব। আমি কালই তাকে লিখে দেব যাতে ও যেন কাউকে বই আর নোটস্ না দেয়।' মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে নরহরিদা অনর্গল বলে গেলেন।

তড়িৎ বেগে কৃতজ্ঞতার সুরে বলে উঠলাম, 'আপনার এ দান জীবনে ভুলব না।'

আমরা মনুনদীর পার ঘেষে হাঁটতে লাগলাম। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার মিলিয়ে গেছে। অন্ধকারটাই তরল থেকে তরলতর হতে হতে হঠাৎ কখন যে জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে ওটা মোটেই লক্ষ্য করিনি। এতক্ষণ আমি এম. এ. পরীক্ষার কথাই ভাবছিলাম। যখন আমার ভাবনা ফুরালো তখন পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জোৎস্নায় পথঘাট যেন ধুয়ে দিচ্ছিল। পূর্ণিমার চাঁদের ছায়া এসে পড়েছে মনু নদীর জলে। দূরে মাঠের গাছ-গাছালি জ্যোৎস্নায় ঝাপসা দেখাচ্ছিল। আর

একটু দূরে ঝোপের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জোৎস্নার শুভ্র আলো মনু নদীর জলে পড়ে অপূর্ব এক লালিত্যের সৃষ্টি করেছে।

দুজনে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত এ দৃশ্যটির কথা খানিকক্ষণ বলাবলি করলাম।

হঠাৎ নরহরিদা বলেন, 'তুমি তো চাকমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাও? কাল আমি ময়নামা যাব। ওই গাঁয়ে একটা এন্‌কোয়্যারি আছে। তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ওই গ্রামে ভাল একটি নাচিয়ের দল আছে। তোমাকে চাকমাদের নাচ দেখাব।'

খুশিতে গদগদ হয়ে বললাম, 'অবশ্যই যাব। আমি দুদিন ছুটি নিয়ে এসেছি। দরকার হলে আরও একদিন বাড়িয়ে নেব। নরহরিদা, আমি যাব আপনার সঙ্গে।'

আরও কিছুক্ষণ একথা-ওকথা বলে আমরা নরহরিদার কোয়ার্টারে ফিরে এলাম।

পরদিন বেলা দশটা।

নরহরিদা আফিসে গেলেন। সাড়ে দশটায় একটা ট্রাইবাল ফাইল নিয়ে এসে আমাকে সঙ্গে করে হেঁটে হেঁটে ময়নামার দিকে রওনা দিলেন তিনি। আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমিও নরহরিদার পেছনে পেছনে চললাম।

প্রায় বারোটায় আমরা ময়নামা পৌঁছলাম। ওখানে চন্দ্রমোহন চাকমার এনকোয়্যারিটি সেরে নরহরিদা আমাকে নিয়ে দুরন্তমণি চাকমার বাড়ি গেলেন। আমাকে দেখিয়ে নরহরিদা ওঁকে বললেন, 'এ ভদ্রলোক ছামনু স্কুলের একজন শিক্ষক। খুব শিক্ষিত ব্যক্তি। আপনাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে উনি খুব আগ্রহী। আপনাদের যে নাচিয়ের দলটি আছে তাদের নিয়ে একটা নাচের বৈঠক (আসর) করুন না। তিনি খুব সন্তুষ্ট হবেন, আর আমিও খুব খুশি হব।'

নরহরিদার কথা শুনে দুরন্তমণি চাকমা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেন। তারপর খুশি খুশি গলায় বলেন, 'নিশ্চয়ই ওঁকে নাচ দেখাব। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা করছি। আপনারা আমার বাড়িতে বিশ্রাম করুন।'

আমাদের জলযোগের ব্যবস্থা করে দুরন্তমণিবাবু ছুটে গেলেন নাচের ব্যবস্থা করতে। আমরা ওঁর বাড়িতে বিশ্রাম করছি।

আধ ঘণ্টার পর খবর এলো তাদের দুটি নাচের মেয়ে অসুস্থ তাই লাগোয়া গ্রাম থেকে এদের পরিবর্তে দুটি নাচিয়ে মেয়ে আনতে গেছে। তাই ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে।

বেলা তিনটে।

নাচিয়েরা এসে গেছে।

এক পাশে চার জন ষোল-সতের বছরের জোয়ান ছেলে। তাদের পরনে লাল রঙের হাঁটু অবধি কাপড়। দেহ অনাবৃত।

অপর পাশে চৌদ্দ-পনের বছরের চারজন সুঠাম যুবতী। এদের পরনে হাঁটু পর্যন্ত বিচিত্র রঙের কাপড়। কোমরের উপরে বক্ষ-বন্ধনী ছাড়া আর কোন আবরণ নেই। গলায় শঙ্খের মালা।

নাচিয়েরা বেশ করে নিজেদের তৈরী জোগরা খেয়ে নিয়েছে। লাল-লাল চোখ। টাল-মাটাল দেহ।

কয়েকটা ছেলে চারপাশে বসে ধুদুগ (বাঁশী) বাজিয়ে চলেছে। একদিকে কয়েকজন চাকমা পাহাড়ী ঢুল (ঢোল) বাজাচ্ছে। আবার কেউ কেউ নাম না জানা পাহাড়ী বাদ্য বাজিয়ে চলেছে। বিভিন্ন রকমের শব্দ উঠছে বাদ্যযন্ত্রগুলো থেকে।

চারদিকে বেশ কিছু চাকমা মেয়ে-পুরুষের জটলা।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্ট হয়ে উঠেছে বাঁশীর সুর। আর ওই আবহ বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছন্দিত পায়ে নেচে চলেছে চাকমা যুবক-যুবতীরা।

জোয়ান-জোয়ানীরা নাচতে-নাচতে মুখোমুখি হচ্ছে। পরস্পরের

মাথায় মাথা ঠেকাচ্ছে, হাতে-হাত মিলাচ্ছে, গায়ে গা লাগাচ্ছে। তারপর পিছন দিকে পা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে অপরূপ ভঙ্গিতে পিছিয়ে এসে থামছে। মাত্র এক মুহূর্ত। আবার সামনের দিকে ঝুঁকে ছন্দিত পা ফেলে-ফেলে অপর দলটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

দুর্বার নাচ—উদ্দাম নাচ—চললো বহুক্ষণ।

একটা দৃশ্য খুব ভাল লাগলো। তাদের সমাজের সঙ্গে আমাদের সমাজের একটা মিল খুঁজতে চেষ্টা করলাম।

ওদের সমাজে উৎসবে-পূজোয়-বিয়েতে যুবক-যুবতীদের যৌন নৃত্যের রেওয়াজ আছে এবং আশৈশব তারা একত্রে নাচতে অভ্যস্ত। পরস্পরের অঙ্গ স্পর্শ করলে এদের চিত্ত-বিক্ষেপ হয় না। কিন্তু আমাদের সমাজে পরপুরুষ বা পরনারীকে চোখে দেখলে পাপ হয়। এবং, ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে বড় ভাইয়ের দেখা নিষেধ। আমাদের সমাজের লোক অনাত্মীয়ের সঙ্গে অনাত্মীয়ার মৌখিক আলাপেই যখন বিভীষিকা দেখে, তখন দৈহিক সংঘর্ষে যে নরকের সৃষ্টি করবে এতে আর আশ্চর্য কি!

নাচ দেখে তৃপ্ত হয়ে আমরা সন্ধ্যে নাগাদ নরহরিদার কোয়ার্টারে ফিরে এলাম।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি নরহরিদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কোন্ বছর থেকে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন?'

নরহরিদা বলেন, 'পঞ্চাশ সাল থেকে।'

খুশি হয়ে আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা নরহরিদা, আমি ছামনুতে অনেক প্রাচীন চাকমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁরা কোথা থেকে ভারতে এসেছেন? উত্তরে অনেকে অনেক রকম কথা বলেছেন। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। আপনি কি জানেন ওঁরা কি ভারতের আদিম অধিবাসী, না বাইরের কোন জায়গা থেকে ভারতে এসেছে?'

নরহরিদা খুশি হয়ে বলেন, 'খুব সুন্দর প্রশ্ন। তুমি তাদের সঙ্গে

বাস করছ, তোমার তাদের সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। আমি তাদের সম্পর্কে অনেক বই পড়েছি।'

বললাম, 'তাহলে তো তাদের সম্পর্কে আপনার অনেক পড়া আছে। বলুন না নরহরিদা, চাকমা উপজাতিরা কোথা থেকে ভারতে এসেছিল।'

নরহরিদা গুরু গম্ভীর স্বরে বলতে থাকেন, 'কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা, দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে সমুদ্রে হল হারা। হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন, শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।'

'গুরুদেবের এ সত্যবাণী ভারতের ইতিহাসে এক স্থায়ী স্তম্ভ। বহুজাতি-উপজাতি তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে এ ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিল। ওরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছিল এ দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও মৈত্রীসূত্র দেখে। সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা দেশের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল অনেক-অনেকদিন আগে।

অতি প্রাচীন কালে হিমালয়ের পাদদেশস্থ, উত্তর ভারতের প্রাচীন সাংপুনদীর (বর্তমান ব্রহ্মপুত্র) তীরবর্তী চম্পক নগরে চাকমা রাজকুমার বিজয়গিরি অব্রাদেশ বা রোয়াং রাজ্য জয় করেছিলেন। কালের প্রভাবে ক্রমে ক্রমে চাকমা উপজাতিরা রাজ্য বিস্তার করে ওখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে আরাকান ও উত্তর ব্রহ্মে এক সমৃদ্ধ চাকমা রাষ্ট্র। চাকমা উপজাতি ব্রহ্ম দেশের স্বাধীন জাতিকে পরাজিত করে পাঁচশ বছরেরও বেশী সময় ধরে ওই দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে রাজ্য শাসন করতে সমর্থ হয়। ওই সময় আরাকান ছিল অনুন্নত। রাজকুমার বিজয়গিরি এবং তাঁর অনুচরেরা ব্রহ্মদেশে এসে বিভিন্ন সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করেছিলেন। এতে বিভিন্ন রক্তের মিশ্রণে স্থান, কাল, অবস্থা ভেদে তাদের আচার, অনুষ্ঠান এবং প্রকৃতিতে সবই অনুন্নত শ্রেণীর বিবর্তন ঘটে।

মঘ সম্প্রদায় মনে করে চাকমারা মুঘলদের বংশধর। জে. পি. মিলস সাহেব মনে করেন, চাকমা উপজাতির অনেকে সপ্তদশ শতকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, মুসলমানী নাম ও খেতাব নেয়। ডক্টর দীনেশ-চন্দ্র সেনও একই মত পোষণ করেন। ওঁর মতে, ওই সময়ে মুঘলদের প্রাধান্য ছিল বলে তাঁদের খুশি করার জন্যে মুসলমানী 'খাঁ' খেতাব গ্রহণ করে চাকমারা।

যেমন, শ্রীশ্রীজয়কালী জয়নারায়ণ জব্বার খাঁ—১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, জয়কালী সহায় ধরম বক্স খাঁ—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ ইত্যাদি। তাঁদের খেতাব দেখে বুঝা যায় তারা হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিল।

পরবর্তীকালে তারা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সবশেষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে সবাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস থেকে জানা যায়, চাকমা রাজমহিষী শ্রীমতী কালিন্দী রানীর শাসনকালে, চাকমারা পুরোপুরি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে।

লিউইন সাহেব পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের ব্রহ্মদেশীয় অনুকরণে খ্যয়ংথা এবং টংথা এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। 'খ্যয়ং' অর্থে নদী, এবং 'টং' অর্থে পর্বত আর 'থা' অর্থে সন্তান বুঝায়। অতএব যারা নদীর তীরে বাস করে ওরা নদীর সন্তান আর যারা পাহাড়ে বাস করে পাহাড়ের সন্তান বলা হয়। এ কারণে লিউইন সাহেব চাকমাদের খ্যয়ংথা শ্রেণীতে ফেলেছিলেন।

ত্রিপুরার রাজমালার গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় কৈলাশ চন্দ্র সিংহ মশায়ও চাকমাদের 'খ্যংয়থা' বংশের এক শাখা বলে মনে করেন।

নরহরিদার সারগর্ভ বক্তৃতা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

আমি নরহরিদাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'নরহরিদা' ওদের ভাষা সম্পর্কে কিছু বলুন না?'

নরহরিদা বলে ওঠেন, 'চাকমাদের মূল ভাষা বাংলা হলেও বাংলা ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন

ভাষার সংস্পর্শে পৃথিবীর যে কোন ভাষার রূপান্তর স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলা ভাষাতেও প্রচুর বিদেশী শব্দ স্থান করে নিয়েছে। এ ভাবে চাকমা ভাষায়ও আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, পালি, ককবরক ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর কারণ স্বরূপ বলা যায় ওরা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন লোকের সংস্পর্শে আসাতে তাদের ভাষায় মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন ভাষা প্রবেশ করেছে। আবার ওদের উচ্চারণ দোষে কোন কোন সুন্দর শব্দ বিকৃত উচ্চারণে পরিবর্তিত হয়েছে।'

নরহরিদার জ্ঞানের গভীরতা দেখে অভিভূত হলাম। অনেক রাত হয়েছে। তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালবেলা হাত-মুখ ধুয়ে বসে আছি। হঠাৎ নরহরিদা ঘরের ভিতর থেকে এসে বলেন, 'দুধ নষ্ট হয়ে গেছে, চলহে বিমল ছৈলেংটা বাজার থেকে চা খেয়ে আসি।'

বললাম, 'ঠিক আছে, চলুন।'

আমরা দুজনে ছৈলেংটা বাজারে গিয়ে চা-নাস্তা খাচ্ছি, এমন সময় কয়েকজন লোক উল্লাসে বলে উঠল, 'ওই যে বৈষ্ণব চাকমা। ওকে ডাক। ও ভাল গান গাইতে পারে।'

একজন যুবক এগিয়ে বৈষ্ণব চাকমাকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'বৈষ্ণব জেঠা, এদিকে এসো।'

আমরা পাশের দোকানে চা খাচ্ছি আর গল্প গুজব করছি।

তখন সবার দৃষ্টি বৈষ্ণব চাকমার দিকে।

আমাদের দোকান থেকে একজন উৎসাহী যুবক এগিয়ে বৈষ্ণব চাকমার হাত ধরে বলে, 'জেঠা, এদিকে এসো। আমাদের দু'একটা গান শোনাও।'

যুবকটি ওকে টেনে আমাদের চা দোকানে এনে বসায়। তারপর দোকানীকে বলে, 'ওহে অজয় বাবু, জেঠাকে কিছু নাস্তা আর এক কাপ চা দিন।'

বলতে বলতে আমাদের চা দোকানের সামনে লোকের বেশ বড় জটলা হয়ে গেল।

চা পর্ব শেষ করে বৈষ্ণব চাকমা কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেয়। তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'কোন্ গান গাইব বাবুজনেরা?'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ কোন্ গান জানেন বৈষ্ণব জেঠা?'

তিনি বলেন, 'এই ধরুন, কির্বারির বারোমাসী, তান্যাবীর বারোমাসী, রঞ্জন মালার বারোমাসী আর কালিন্দী রাণীর বারোমাসী।'

নরহরিদা হঠাৎ বলে ওঠেন, 'তাহলে জেঠা তান্যাবীর বারো-মাসীটাই গাও।'

বৈষ্ণব চাকমা আবার জোরে দুবার কেশে গলাটা ঠিক ঠাক করে নেয়। তারপর সুরেলা কণ্ঠে গেয়ে চলেন :—

তান্যাবি রান্যাত যায় সুগুরি দাদি তানের লোই,
পুরান কথা ইদত্ তুমি যে গুজুরি গুজুরি কানের লোই।
হায়রে নাদিন তান্যাবি—
তুল্যা সাঙু পার্জ্যা দিলে কার লাগি।
তান্যাবি কুরা পুজে, সেই কুরা বুয়া করকরায়।
বোনোই বোনোই বাঝিন' বেচমর পরাণে ধরপরায়।
তান্যাবি ভাত খায়, ইত্তুক ইত্তুক উল ঝুল,
গাবুর মর্দে পারি দেদন কুড়ি কুড়ি লোগেচ ফল।
তান্যাবি ছরা ইজে ইজায় মাজে এক কুরুম,
তান্যাবিরে দোল্ দোল্ কনদে পুলে মাথায় এক সুরুং।
তান্যাবি হরিণ পুজে সেই হরিংগুয়া মরিব,
পুরানো আদাম ফেলেই যাদে চোগ পানি পরিব,
তান্যাবি গাঙত যায় কুমম থল ধুপ গরি।
গাবুর মর্দে চোগি আঘন খাগারা হুবতি চুপগরি,

তান্যাবি বেন বুনে বেনর তলে ব-দলা,
তান্যাবিরে ধরি নিলাক কেরেও কাবা মৌনতলা।
তান্যাবি ভাত খায় আর তুলে মেজাঙুত্।
তান্যাবিরে ধরি নিলাক মোনঘরর পেজাঙত,
তান্যাবি ধুন্দা খায় কালগিত তুলে আভারা,
তান্যাবিতুন পরানে মগের পেক্কুয়া ছরার কাভারা।

[তান্যাবি পুরনো জুমে গিয়ে লাউ শাক কুড়াচ্ছিল, ও অতীত দিনের কথা স্মরণ করে হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। হায়রে নাতনী তান্যাবি—

যে মই তুলে রেখেছিল ওটা আবার কার জন্যে পেড়েদিলে। তান্যাবি মুরগী পালছিল, ওই মুরগীগুলো ডিম পাড়তে কর কর করে ডাকছে।

ওহে জামাইবাবু তুমি বাঁশী বাজিওনা, আমার প্রাণ ধরফর করছে,
তান্যাবি সামান্য চালতা তরকারির ঝোল দিয়ে ভাত খায়,
যুবকেরা রোগেছ (একপ্রকার বুনোফুল) ফুল ওকে দিচ্ছে,
তান্যাবি মাছ ধরতে গিয়ে এক কুরুম (বেতের থলে) মাছ পায়,
ও (তান্যাবি) সুন্দরী হলেও অতীব সরল।
তান্যাবির পোষা হরিণটা মরে যায়,
ওটা (হরিণটা) ফেলে দেবার সময় তান্যাবির চোখে জল আসে,
তান্যাবি জল আনতে গিয়ে কলসীটা ধুপ করে ঘাটে বসায়।
যুবকেরা তখন ওর জন্য নল খাগড়ায় লুকিয়েছিল,
তান্যাবি কাপড় বুনছে কিন্তু তাঁতের নীচে মাকুই পড়ে আছে,
ঐ দিনই ওকে জোর করে ধরে 'কিরেত কাবা' পাহাড়ে নেয়।
তান্যাবি মোজাঙে তুলে ভাত খায়,
ওকে টংঘরের বারান্দায় রাখা হয়েছে,
তান্যাবি তামাক খেতে কল্কিতে অগ্নিসংযোগ করে,
এবার তান্যাবির ছড়ার কাঁকড়া খেতে ইচ্ছে হয়েছে।]

আরও একটি গান শোনে সবাই যে যার কাজে চলে যায়।

নরহরিদা বৈষ্ণব চাকমাকে আরও একবার চা আর নাস্তা খাইয়ে দিলেন।

আমি বৈষ্ণব চাকমাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'তারপর জেঠা তুমি একদিন বিকেল বেলায় ডেভাছড়ায় এসো না। তোমার গান ভাল করে শুনব।'

বৈষ্ণব চাকমা বললো, 'আচ্ছা যাবো একদিন।' একটু থেমে আমায় জিজ্ঞেস করে, 'কার বাড়ি যাব?'

বললাম, 'ডেভাছড়ায় গিয়ে জিজ্ঞেস করবে বিমল মাস্টারের বাড়ি কোনটা? তখন যে কেউ আমার ডেরাটা দেখিয়ে দেবে।'

বৈষ্ণব চাকমা মাথা নেড়ে, ওর সম্মতির কথা জানিয়ে চলে গেল।

দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়া সেরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। তারপর বেলা তিনটায় নরহরিদাকে বললাম, 'বেশ আনন্দে তিনটে দিন কাটলো। অপার পরিতৃপ্তি নিয়ে চললাম। অনেক দিন মনে থাকবে। এম. এ. পলিটিকেল সাইয়েন্সের নোটের কথা ভুলে যাবেন না কিন্তু। তাহলে যাই নরহরিদা।'

নরহরিদা আমাকে বললেন, 'যাই বলতে নেই, বলো, আসি। তোমার পড়াশোনার কথা আমায় বলতে হবে না। তোমাকে আমি এম. এ. পাশ করাবই। আচ্ছা এসো।'

॥ ষোল ॥

আজ রোববার। স্কুল ছুটি। কোন কিছুতে তাড়া নেই। তাই অনেকক্ষণ ধরে প্রাতঃভ্রমণ করলাম।

কাল সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। আজ আকাশ পরিচ্ছন্ন। এখন রোদ পাতলা-মিষ্টি। হাওয়া ভিজে ঘ্রাণ বয়ে আনছিল। রাস্তায় এখানে-ওখানে কাদা জমে আছে।

বি. এ. পাশ করেছি তিন বছর আগে। এম. এ. পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছি। নরহরিদার আন্তরিক প্রচেষ্টায় এম. এ. পরীক্ষার সব নোট্স পেয়ে গেছি। প্রিপারেশন মোটামুটি চলছে। কিছুদিনের মধ্যে ফাইন্যাল সাজেশনস্ পেয়ে গেলে এবারই পরীক্ষায় বসার ইচ্ছে আছে, নতুবা আগামী বছর পরীক্ষায় বসবই।

আমার এসব খবর সুদূর বাংলাদেশে চলে গেছে। যে কাকা পাকিস্তান ছেড়ে আসার সময় বিধবা মাকে কোন সাহায্য করেননি, আমাদের আড়াই কানি জমি গায়েব করে দিয়েছেন, মা মারা যাবার পর অনেক লেখালেখির পর যিনি মাত্র একশ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন, ওই কাকা ভাস্তের খবর নেবার জন্য প্রাণ উথলে উঠেছে। তিনি এখন উঠে-পড়ে লেগেছেন আমার বিয়ে দেবার জন্যে। যদিও এতোদিন তিনি আমার কোন খোঁজ-খবরই নেননি, তবুও গুরুজন বলতে এ কাকাই।

এ পৃথিবীতে আত্মীয় বলতে আর কেউই নেই। আমার যে বড় বোনকে বাবা বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিও মারা গেছেন গেল বছর। আর যে ছোটদিকে মুসলমানেরা ১৯৪৬ সালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার কোন হদিস আজও পাইনি।

আমার একমাত্র আত্মীয় কাকাবাবু খবর পেয়েছেন আমি নাকি

এক চাকমা মেয়ের সঙ্গে দিব্যি ঘর গেরস্থালী করে গুছিয়ে বসেছি। আমাদের মধ্যে নাকি হাফ বিয়ে হয়ে গেছে। শুধু পুরোহিত ডেকে শঙ্খ বাজলেই নাকি বিয়ের সার্টিফিকেট পেয়ে যাব।

জানিনা, গোমতী আর গোমতীর মা বাবা এসব খবর জানলে কি ভাববে।

গোমতী আমাকে ভালবাসে সত্যি। কিন্তু ও আমাকে জীবন-সঙ্গী হিসেবে পেতে চায় কিনা এখনও টের পাইনি। দুজন যুবক-যুবতী একসঙ্গে বছরের পর বছর থাকলে, যে কোন মুহূর্তে পদস্খলন হতে পারে, কিন্তু এতো বছর এক সঙ্গে কাটালাম, আজও ঐরকম কোন অঘটন ঘটেনি। ও আমায় ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। আমি কোনটা খেতে ভালবাসি, কি আমার পছন্দ, ওর সব মুখস্থ। কখন আমার শরীর খারাপ করলো ও আমার মুখ দেখেই বলে দিতে পারে। একবার কার কাছে শুনেছি, ও নাকি বলেছে আমায় বিয়ে দিয়ে ও বিয়ে করবে, তার আগে নয়।

শুনেছি কাকাবাবু নাকি একবার আগরতলায় এসেছিলেন। আমার মা যে বাড়িতে ঝি-এর চাকরী করতেন ওই মৃণালবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

মৃণালবাবু এখন বিরাট বড়লোক। গাড়ী, বাড়ি সব আছে। ওঁর দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ওই মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন দুই ধনীর দুলালের সঙ্গে। জামাইরা লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানে না। কিন্তু অর্থ আছে প্রচুর। জামাইদের তিন 'ম' তে কোন এলার্জী নেই। ওরা প্রায়ই মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে যায়। তখন স্ত্রীদের প্রতি চলে অকথ্য অত্যাচার আর নির্যাতন। মেয়েরা মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি গিয়ে পিঠ-হাত দেখিয়ে আসে ওদের ওপর কিরূপ নিগ্রহ চলছে। মৃণালবাবু আর ওঁর স্ত্রী রাগে গিসগিস করে ফুঁসতে থাকে কিছুক্ষণ। তাপরর নিরুপায়ের মতন ঝর ঝর করে চোখের জল ফেলে।

ওই মৃণালবাবুর আরেক মেয়ে আছে। মেয়েটি খুব সুন্দরী। গান-বাজনাও শিখেছে। কিন্তু মা সরস্বতী লেখাপড়ায় ওকে বেশী উপরে উঠতে দেননি। আগের জামাইদের আচরণে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে এবার চেষ্টা করছেন একজন সচ্চরিত্রের শিক্ষিত চাকরীজীবি ছেলেকে জামাইরূপে বরণ করে নিতে। কিন্তু লেখাপড়া না জানা মেয়েকে কোন্ শিক্ষিত ছেলে বিয়ে করবে ?

মৃণালবাবু প্রচুর টাকার প্রলোভন দেখিয়েও কোন সদাচারী শিক্ষিত ছেলে পাচ্ছেন না। কাকাবাবুর কাছ থেকে আমার এত ডিগ্রীর খবর পেয়ে মৃণালবাবু আর তাঁর স্ত্রী লাফিয়ে উঠলেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গেলেন ওঁরা।

তাঁদের বাড়ি থেকেই তো স্কুল ফাইন্যালে প্রথম বিভাগে পাশ করেছি। এঁরা আমার নাড়ী-নক্ষত্র জানেন। জানেন আমি বিনয়ী-নম্র।

মৃণালবাবু আমার খোঁজ-খবর নিয়েছেন। চাকমা মেয়েরূপী যে পেত্নীটি আমার ঘাড়ে চেপে বসে আছে, ওই সম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান করেছেন। ওঁরা জেনেছেন ও কুৎসিত পেত্নী নয়, ও অপূর্ব সুন্দরী। তাঁরা আরও জেনেছেন ও আমাকে ধরে এখনও খায়নি বা আপাততঃ খাবার কোন মতলব নেই।

তাই মৃণালবাবুর উৎসাহে কাকাবাবু আমার সঙ্গে এ সম্বন্ধ করার জন্যে খুব তোড়জোড় শুরু করেছেন। কাকাবাবু ঠিক করেছেন মৃণালবাবু, মৃণালবাবুর স্ত্রী আর পাত্রীকে নিয়ে সরজমিনে তদন্ত করতে আমার ডেরাতে আসবেন। পাত্রীও পাত্রকে দেখতে পাবে তখন।

আমি পাত্রীকে দেখেছি চার বছরের। তাদের বাড়ি থেকে আসার পর আমি তাদের সঙ্গে কোন সংস্রব রাখিনি।

মৃণালবাবু ওরা আসছেন রটে যাওয়া চাকমা পেত্নীটি হবু জামাইকে কতটুকু গিলে বসে আছে সরজমিনে তদন্ত করতে। বিয়ে হয়ে গেলে জামাইকে যে অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতে হবে না তা ওঁরা ভালভাবেই

জানেন। তাঁদের টাকা-পয়সা আছে। টাকা ছাড়লে এম. এ. পাশ করা জামাইকে যে কোন মুহূর্তে গণ্ডগ্রাম থেকে সরিয়ে যে কোন ভাল জায়গায় একটা ভাল চাকরী দিয়ে দিতে পারবে।

কাল কাকাবাবুর পত্র পেয়েছি। তিনি দুঃখ করে পুরনো অনেক কথা সাফাই গেয়েছেন, আমি ছাড়া এ পৃথিবীতে এত শিক্ষিত আত্মীয় নেই, ওরকম অনেক কথা লিখেছেন। আমার যে অতিসত্বর বিয়ে করা প্রয়োজন ওরকম নানান হিতোপদেশ দিতে ছাড়েননি।

মাঝে মাঝে ভাবি বত্রিশ বছর হয়ে গেল, যৌবনের বেশীর ভাগ সময়ই তো চলে গেছে। বিয়ের ব্যাপারটা হয়ে গেলে খারাপ হতো না। চাই একজন বুদ্ধিমতী মধ্যবিত্ত ঘরের সুন্দরী মহিলা। একটু বয়স্কা হলে ভাল হয়। বয়সের বিরাট ফারাক হলে মনের মিল না হওয়াই স্বাভাবিক। মোটের ওপর চাই একজন সুশ্রী, নরম স্বাভাবের মিষ্টি মেয়ে। স্পেশাল কোয়ালিফিকেশন একটু গান জানলে খুবই ভাল হয়। রান্নাবান্না ভাল জানা, এটাতো মেয়েদের জন্মাবধি কোয়ালিফিকেশন। রান্না-বান্না ভাল না জানলেও ক্ষতি নেই। এ সম্পর্কে আমার কিছু জানা আছে। গোমতীকে তৈরী করতে গিয়ে 'পাক প্রণালী' বই কয়েকটা পড়েছি। মাংস-পোলাও-বিরিয়ানী তো আমিই গোমতীকে হাতে ধরে শিখিয়েছি।

আজকাল আমি যেন একটু ভাবুক হয়ে গেছি। পাত্রীর মা-বাবাকে তো আমি ভাল রূপেই জানি। মৃণালবাবুর স্ত্রী কিন্তু খুব খিটখিটে। স্বামীর সঙ্গে তো প্রায়ই এটা ওটা নিয়ে খটাখটি লেগেই থাকতো। কিন্তু মৃণালবাবু অনেকটা কনসিডারেট। তিনি আমাকে তাড়াতে চাননি। উনি চেয়েছিলেন আমার চাকরি না হওয়া অবধি তাঁদের ওখানেই থাকি। কিন্তু রাতারাতি বড়লোক হওয়া গিন্নীর স্বামীর কানের কাছে ঘেনানি পেনানির জ্বালায় এবং শেষে 'স্ত্রীর রণং দেহি' মূর্তি দেখে, একদিন মৃণালবাবু আমাকে বলে দিয়েছিলেন, বাপু হে, তুমি অন্য কোথাও গিয়ে চাকরী খোঁজ।

আর আজ ওই ভদ্রমহিলা চান আমাকে জামাই করতে। বিধির কি অপরূপ লীলা। ওই মেয়েটি আবার মার মতন খিটখিটে হবে না তো! তাহলে আমার সারাটা জীবন মাটি করে দেবে।

শুনেছি মেয়েটি নাকি বেশ সুন্দরী। ও নাকি ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট মিউজিক কলেজ থেকে গান শিখে লক্ষ্নৌ ভাতখণ্ডে বিদ্যাপীঠ সিলেবাসে প্রিপারেটরী, ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছে। এখন নাকি 'বিশারদ' পড়ছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে গানে মেয়েটা ওস্তাদ। কিন্তু জেনারেল এডুকেশনে খুব বেশী চৌকাঠ পার হতে পারেনি। মা সরস্বতী এদিকটায় বাঁধ সেধেছেন। বড়লোকের আদুরে মেয়েদের এদিকটায় খুব বেশী হয় না বলে শুনেছি।

মেয়েটা সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে আমি সন্তুষ্ট। আমি তো ওকে পেলেই গ্রহণ করবো। আমার মত প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার, যার তিনকুলে এক কাকা ছাড়া কোন আত্মীয় নেই, ওর জন্য এর থেকে ভাল সম্বন্ধ আর কি করে আশা করতে পারি।

আসলে পাত্রীপক্ষ জেনে ফেলেছে আমি চাকমা মেয়েটির সঙ্গে ঘর-সংসার করছি, যদিও অত্র অঞ্চলের কেউই আমার সম্পর্কে ওরূপ কুৎসা রটায়নি। তবুও ওঁরা যখন জেনেছেন তাই সরজমিনে তদন্ত করতে চান।

নিজের চরিত্র সম্পর্কে আমার কোন ভাবনা নেই। যে কোন টেস্টে অ্যাপীয়ার হতে আমার কোন ভয় নেই।

।। সতের ।।

গোমতীর দেয়া প্রাতরাশ সেরে স্কুলে রওনা দিলাম। যাবার সময় এক ছাত্রীর বাড়ী যেতে হবে অভিভাবকের সঙ্গে কিছু আলাপ করতে। মেয়েটি গত চারদিন ধরে স্কুলে যাচ্ছে না। মেয়েটি এবার পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। ওকে দিয়ে আগামীবার স্কলারশিপ পরীক্ষা দেওয়াতে হবে। ও পড়াশোনায় খুব ভাল। মেয়েটি মেধাবীও। তার কাছ থেকে স্কুল কিছু আশা করতে পারে।

সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। দিনের আলো ম্লান। এক ঝলক শীতল হাওয়ায় পুরনো আমগাছটার পাতাগুলো সিরসির করে উঠলো। বৃষ্টির কয়েকটা ফোঁটা পড়ল আমার গায়ে। বৃষ্টি নামার ভয়ে পা চালিয়ে এগোতে লাগলাম।

যেতে-যেতে লম্বাছিরার ছেলে তনিয়ার সঙ্গে দেখা। ও গরু চড়াতে লংতরাই পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে। ও গরুগুলোকে হেট-হেট করতে করতে পাচন দিয়ে গুতো দেয়। আমাকে দেখে ও বলছে, 'প্রণাম মাস্টারবাবু। ওদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

বললাম, 'প্রণাম। এদিকে এক ছাত্রীর বাড়ি যাচ্ছি। তোর মা বাবা কেমন আছে রে?'

'মা ভালই আছেন। কিন্তু বাবার শরীর ভাল নেই।'

'কেন, ওর আবার কি হলো?'

'আজ কদিন থেকে বাতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন?'

'যা শীত পড়েছে। শীতকালে তো বাতের পোয়া বারো। তোর দিদি কেমন আছে রে?'

'ভালই। দিদি আর অরিন্দমদা তো জুমের গান নিয়ে ব্যস্ত। আর কয়েকদিন পরেই তো জুমের গীতি দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাবে।'

'তাকি নাকি। ভালো খবর খুব ভালো খবর। দেরী হয়ে গেল।

আজ চলিরে।

কথা না বাড়িয়ে মেয়েটির অভিভাবকের বাড়ির দিকে দ্রুতপদে এগোলাম।

তনিয়া গরুগুলোকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চললো।

আমি ছাত্রীর বাড়ি পৌঁছে ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে না কেন?

মেয়ের বাবা বললেন, 'ওই দিন স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে বাড়ি এসেছে। গত কয়েকদিন ধরে ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছিল। এখন একটু ভাল। আজ ভাত দিয়েছি। আশাকরি পরশু থেকে স্কুলে যেতে পারবে।'

বললাম, 'পরশু স্কুলে পাঠাবেন কিন্তু। ওর কাছ থেকে স্কুল কিছু আশা করছে।'

মেয়ের বাবা নম্র ভঙ্গিতে স্মিতহাস্যে বললেন, 'ওটা আপনার আশীর্বাদ। আপনাকে ও খুব ভালবাসে। বাড়িতে এসেই আপনার কথা মুখ থেকে ফেলবেই না। আপনি থাকাতে নাকি ও এত ভাল ফল করতে পারছে।

মুখের ওপর নিজের প্রশংসা শুনে একটু সংকোচ বোধ করলাম। তড়িঘড়ি বললাম, 'তাহলে পরশু মেয়েকে পাঠাচ্ছেন তো? আজ চলি।'

মেয়ের বাবার উত্তর না শুনেই হন্তদন্ত হয়ে স্কুলে যখন পৌঁছলাম তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টির জোর খুব বেশী ছিল না অবশ্য।

যথারীতি ক্লাসের পর স্কুল ছুটি হয়ে গেছে।

বৃষ্টি ধরে এসেছে। গাছগুলো স্থির। থেকে থেকে পাতায়-পাতায় বেয়ে টপটপ করে জল ঝরছে। দিন বুঝি পরিচ্ছন্ন হলো। হালকা রোদ খেলছে।

আমি হেডমাস্টার মশায়ের চেম্বারে ঢুকলাম। তিনি মুখটা গোমড়া

করে বসে আছেন। ওঁর কপালে রাশি রাশি স্বেদবিন্দু। জরুরী দেখে স্কুলের কয়েকট বিষয় নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলাপ করে নিলাম।

আলোচনা শেষে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্ছে! কি হয়েছে স্যার?'

খেদের সঙ্গে হেডমাস্টারবাবু বললেন, 'বিমলবাবু অরিন্দমকে নিয়ে আর পারছি না। তাকে বলেছিলাম ও যেন কৈলাসহরে গিয়ে কলেজে পড়াশোনা করে? কিন্তু ও তা না করে বয়স্ক লোকদের লেখাপড়ার ব্যাপারে স্কুল খুললো। গাঁয়ে প্রাচীন লোকদের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছে সত্যি কিন্তু—' বলতে বলতে তিনি থেমে গেলেন।

হেডমাস্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে, খুলে বলুন না স্যার?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেডমাস্টারবাবু আকুল কণ্ঠে বলেন, 'অরিন্দম আমাকে একটা মুশকিলে ফেলে দিল।'

'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'অরিন্দমের নামে একটা কুৎসা রটেছে।'

'কি কুৎসা?'

'অরিন্দম লম্বাছিরা চাকমার মেয়েকে ভালবাসে। তাদের অবাধ মেলামেশায় বান্ধবী নাকি অন্তঃসত্বা।'

হতচকিত হয়ে বললাম, 'তাই নাকি।'

হেডমাস্টারবাবু বিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'তাহলে কি করা যায় বলুন তো বিমলবাবু।

কিছুক্ষণ হেডমাস্টারবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে আছেন।

মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে হেডমাস্টারবাবুর মুখ দেখে সন্দেহের কোন কারণ থাকতে পারে না যে, তিনি মানসিক দিক থেকে পীড়িত-ব্যথিত-মর্মাহত।

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। ওঁর মনের পরিবর্তনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলাম। তিনি যেন হতচেতন অবস্থায় বসে আছেন।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম ওঁর মুখ রাঙা—কঠিন—সবল হয়ে উঠল।

ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে উনি বলে উঠলেন, 'আমি অরিন্দমকে ত্যাজ্য পুত্র করব। এ কুলাঙ্গার ছেলেকে বাড়ি ঢুকতে দেব না। তার মুখদর্শন করাও পাপ।'

হেডমাস্টারবাবুর শরীর কাঁপছিল। চোখ চিকচিক করছে। নিজেকে সামলে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকেন।

আমি একটা ভেঙে যাওয়া স্বপ্নকে মনের মধ্যে অনুভব করলাম। এবং ওই অনুভূতির সঙ্গে ধীরে ধীরে ভাঙা-ভাঙা স্বরে বললাম, 'স্যার, হুট করে একটা কিছু করবেন না। ওদের দুজনের কথাটা একটু ভাবুন। তাদের যৌবনের প্রারম্ভের রঙীন স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেবেন না।'

আমার কথা শুনে তিনি টেবিলে মাথা রাখলেন। অনেকক্ষণ কি জানি ভাবলেন। আমি বিমূঢ় হয়ে ওঁর সামনে বসে আছি। তারপর প্রায় পঁচিশ মিনিট পর মাথা তুললেন।

তখন হেডমাস্টারবাবুকে বড় দীন মনে হলো। পরিচ্ছন্ন মুখ বড় ম্লান দেখাল। তিনি ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, 'চলুন আজ উঠি।'

ডেরায় ফিরতে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেছে।

ফিরে দেখি কাকাবাবু, মৃণালবাবু আর ওঁর স্ত্রী মোড়া পেতে আমার ডেরার উঠোনে বসে চা খাচ্ছেন। ওঁদের দেখেই আমি আমার গেটের সামনে আড়ালে দাঁড়িয়ে আঁড়ি পেতে তাঁদের কথা শুনতে শুরু করলাম।

দেখলাম গোমতী ওঁদের সামনে বসে কিসব কথার উত্তর দিচ্ছে। কথা শোনা যাচ্ছিলো না। আঁচ করলাম, 'সরজমিনে তদন্ত শুরু হয়ে গেছে। জেরা আরম্ভ হয়েছে প্রথম ও প্রধান সাক্ষীর। সাক্ষীর

সাক্ষ্যতে জড়তা আছে বলে টের পেলাম না। শান্ত স্থির হয়ে প্রশ্ন-কর্তার প্রশ্ন শুনে ধীরে সুস্থে ঠিক মতন উত্তব দিয়ে যাচ্ছে গোমতী।

ওঁরা সবাই বাইরের গেটটাকে পিছন দিয়ে বসেছিলেন বলে এবং কেউই আমাকে দেখতে পারছিলেন না। গোমতী গেটটার সোজাসুজি বসেছিল বলে ও আমায় দেখে ফেলেছে। ও আমার দিকে চেয়ে কিছু বলতে চেয়েছিল, কিন্তু আমার চোখের ইঙ্গিত পেয়ে ও চেপে যায়।

গোমতীর জেরা শেষ হয়ে গেলে আমি ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে ডেরায় ঢুকলাম। কাকাবাবু প্রথম আমায় দেখলেন। দেখেই বলেন, 'এই তো বিমল এসে গেছে।' উনি আমাকে বলেন, 'তুই অনেক বড় হয়ে গেছিস। কতকাল পবে তোকে দেখলাম।'

এবার সবার দৃষ্টি আমার ওপর পড়লো।

আমিও দ্রুত লয়ে নগ্নপদে, নত মস্তকে একে একে সবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। মৃণালবাবুর স্ত্রী আমার মাথায় একটা চুমো খেয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'বেঁচে থাক বাবা। দীর্ঘায়ু হও।'

এবার কাকাবাবুকে বললাম, 'আগে খবর দিয়ে এলেন না। আমার ডেরাটা খুঁজে নিতে কত অসুবিধে হলো আপনাদের।'

আমার কথার উত্তর দিলেন মৃণালবাবু। তিনি বলেন, 'আমরা আগরতলা থেকে অ্যাম্বাসাডারে সোজা চলে আসি মনুনদীর ওপারে। অ্যাম্বাসাডারে আমার স্ত্রী আর মেয়েকে বসিয়ে আমি আর তোমার কাকাবাবু চলে এলাম ছামনু বাজারে। ওখানে এক ওষুধের দোকানে তোমার কথা জিজ্ঞেস করাতে ডাক্তারবাবু বলেন, 'বিমল মাস্টারের বাড়ি খোঁজ করছেন ; কেন বলুন তো ?'

'ওঁর বিয়ের ব্যাপারে আমরা আগরতলা থেকে আসছি।'

'তাই নাকি। বসুন, বসুন।' তিনি উল্লাসিত হয়ে আমাকে আর তোমার কাকাবাবুকে ওঁর দোকানে আদর করে বসালেন।

আমি একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কি জানি বলেছেন ডাক্তার

বাবু। তবুও বুকে সাহস নিয়ে ধীর কণ্ঠে বললাম, 'তারপর।'

তখন মৃণালবাবু বলেন, 'তোমার সম্পর্কে উনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুমি নাকি এক বিশেষ সাড়া জাগাতে পেরেছ। অভিভাবকদের কাছে তুমি নাকি দেবতুল্য। তিনি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে তোমার বাড়িটা চিনিয়ে দিলেন।'

মুখের ওপর আমার প্রশংসা শুনে আমি সঙ্কোচ বোধ করলাম। কিন্তু মনে মনে ভাবি আমার ইন্টারভিউ ভালভাবেই এগোচ্ছে। আমার সম্পর্কে ভাল সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন ওঁরা।

সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবু বলেন, 'বিমল, তুই আমাদের বংশের একটা রত্ন। আমাদের বংশের মুখোজ্জ্বল করেছিস তুই।'

মৃণালবাবুর স্ত্রী দরদী কণ্ঠে বলেন, 'তুমি স্কুল থেকে আসছ? গোমতী বললো, তুমি নাকি সাত সকালে স্কুলে যাও। এত দেরী করে আস?'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'না। আজ একটু দেরী হয়ে গেল। স্কুল সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক মশায়ের সঙ্গে একটা জরুরী বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম।'

মৃণালবাবুর স্ত্রী বলেন, 'গোমতীতো তাই বললো। তুমি নাকি আরও আগে আস।'

মনে মনে ভাবি, আমার যাওয়া-আসা সম্পর্কেও গোমতীকে জেরা করা হয়ে গেছে।

মৃণালবাবুর স্ত্রী ঘরের ভিতর অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ্য করে ডাকলেন, 'এই সুচিত্রা, এদিকে আয়। কি সুন্দর একটা পাখি রে, দেখবি আয়।'

ভিতর থেকে মেয়েলি কণ্ঠে উত্তর এলো, আর একটু ঘুমুতে দাও মা। এতখানি পথ অ্যাম্বাস্যাডারে আসতে-আসতে শরীরের ওপর বড্ড ধকল গেছে। একটু পরেই আসছি।'

কণ্ঠ শুনে বুঝলাম, উনি হলেন হবু পাত্রী।

আমি একটু ভড়কে গেলাম। বড়লোকের মেয়ে। আদরের

তুলালী। এ অজ পাড়াগাঁ দেখে বোধহয় খুব চটে আছে। বোধহয় ভাবছে এখানে থাকলে ও হাফিয়ে উঠবে।

কিন্তু হবু পাত্রী বোধ হয় জানে না, টাকা ছাড়লে হবু জামাইয়ের ট্রান্সফারের অর্ডার হতে দু'মিনিটের প্রয়োজন।

আমার এ ভগ্ন ডেরায় এত রথী-মহারথীর আগমনে লজ্জা-আনন্দ আর ভয়ে জড় সড় হয়ে গেলাম।

মেয়ের অসহযোগিতার কারণে মনটা অন্যদিকে ঘোরাতে বোধ হয় মৃণালবাবুর স্ত্রী হঠাৎ আমাকে বলেন' 'হ্যাঁ, বাবা তোমার ছোট্ট বাসাখানা বেশ সুন্দর। তোমার বোধহয় কোন তরিতরকারী কিনতে হয় না। ফুলে ফলে বেশ সুন্দর করে সাজিয়েছ।'

পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে নত মস্তকে বলে ফেললাম, 'ওটা আমার জন্যে নয়। এ প্রশংসার প্রাপ্য গোমতীর।'

'তাই নাকি।'

গোমতী আমাকে চা এনে দিল। আমার কথাটা শুনে ফেলেছে। ও নিজের প্রশংসা শুনতে পেয়ে দ্রুত পদে রান্নাঘরে চলে গেল।

চা খাওয়ার পর রান্নাঘরে গিয়ে গোমতীকে চাপা গলায় বললাম, 'কি-কি আনতে হবে শীঘ্র বল। এখনি বেরোতে হবে।'

গোমতী মাথা নেড়ে নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললো, 'না—না। বোরোবার দরকার নেই। ওঁরা আগরতলা থেকে রান্নার অনেক জিনিস নিয়ে এসেছেন।'

বললাম, 'তাই নাকি।' তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি-কি এনেছেন?'

গোমতী বললো, 'মুরগী, ডিম, আলু, পেঁয়াজ, তৈল আর কয়েক পাতিল মিষ্টি।'

বললাম, 'এতো—' তারপর গোমতীকে রাগাবার জন্য আমি বললাম, 'দেখলিতো কি বড়লোক শ্বশুর পাচ্ছি।'

কথাটা বলে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, মুখটা ছাইয়ের মতন

সাদা হয়ে গেছে।

রান্নাঘর থেকে হঠাৎ দেখলাম সুচিত্রা নামক মেয়েটি হাতের চুড়ির রিনি-ঝিনি আওয়াজ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। দেখলাম মেয়েটির গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল, টানা-টানা চোখ, রাজহাঁসের মতন গলা, ধারালো চিবুক। হাতের আঙুলগুলো লম্বা-লম্বা। সুঠাম দেহ। আরও দেখলাম ওর চোখ দুটো ফোলা-ফোলা আর চুল উস্কোখুস্কো।

মৃণালবাবুর স্ত্রী উঠে গিয়ে ধমক দিয়ে ফিসফিস গলায় বললো, 'যা তাড়াতাড়ি ঘরে যা, সুটকেশটা খুলে একটু সেজে-গুজে আয়।'

সুচিত্রা জেদের সঙ্গে বললো, 'যখন ঠিক করেছ আমাকে বনবাসে দেবেই, তখন যিনি আমাকে গ্রহণ করবেন তিনি সাদাসিধে ভাবেই দেখে নিন। চুনকাম করে কি হবে মা।'

আমিও হবু পাত্রীর সঙ্গে একমত। সেজেগুজে কি লাভ। স্নো-পাউডারের প্রলেপ লাগালে তো কৃত্রিম হয়ে গেল। কৃত্রিম জিনিস তো অপাঙক্তেয়।

কাকা আমাকে ডাকলেন। আমি ধীরপদে উঠোনে গেলাম। আমার লাস্ট ইন্টারভিউ। এর জন্যে হবু পাত্রীর সামনে দাঁড়ালাম।

আমার হবু স্ত্রী হাত তুলে আমাদের নমস্কার করে বললো, 'আমার নাম সুচিত্রা ভট্টাচার্য। আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।'

বললাম, 'এটা আমার সৌভাগ্য।'

মনে মনে ভাবলাম মেয়েটা বেশ স্মার্ট তো।

মৃণালবাবুর স্ত্রী ওঁর মেয়েকে বলে, 'সুচিত্রা তুইতো ভাল মাংস রাঁধতে পারিস। এবার কাপড়টা ছেড়ে মাংসটা রেঁধে ফেল না।'

সুচিত্রা বললো, 'আমি খুব ক্লান্ত। তুমি যাও মা। আমি কাল রেঁধে ওঁকে বুঝিয়ে দেব যে আমি ভাল মাংস রাঁধতে পারি।'

মনে মনে বলাম, না, আর মাংস রান্নার ইন্টারভিউ দিতে হবে না। ইউ আর সিলেক্টেড।

হঠাৎ মৃণালবাবু স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের রান্নায় আর কতক্ষণ লাগবে ?'

মৃণালবাবুর স্ত্রী গোমতীকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'আমি যা যা বলেছিলাম, ওগুলো সব রান্না হয়ে গেছে তো ?'

গোমতী উত্তর দিল, 'আর দশ মিনিটের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে।' ওর মুখ হাত বেয়ে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ঝরছে।

মৃণালবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলেন, 'আর এক ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের খাবার দিতে পারব।'

'বেশ তাই হবে।' বলে মৃণালবাবু আমার কাকা নারায়ণ বাঁড়ুজ্যেকে বলেন, 'চলুন, গ্রামটা একটু ঘুরে দেখে আসি।'

কাকাবাবু আমায় বলেন, 'চলরে বিমল, তোদের গ্রামটা আমাদের দেখিয়ে আন।'

আমি ওদের ডেভাছড়া গ্রামটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টিলা-টক্কর দেখিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পর ডেরাতে ফিরে এলাম।

ডেরাতে এসে আমার ভাবী শ্বশুর মশায়কে বললাম, 'আপনারা এবার চান করে আসুন।'

উত্তরে উনি বলেন, 'না, আমরা চান করব না। আমরা আগরতলা থেকে চান করে এসেছি। আমরা এখানে হাত মুখ ধুয়ে নেব।'

আমি কাক-স্নান সেরে এসে সবাইকে বললাম, 'যান আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।'

বাথরুমে প্রচুর জল ছিল। সবাই একে একে হাত-মুখ ধুয়ে এল।

এমন সময় নরহরি দত্ত এসে হাজির। ওঁকে আনতে গোমতীর বাবাকে মৃণালবাবুর অ্যাম্বাস্যাডারটি দিয়ে ছৈলেংটা পাঠিয়েছিলাম। জরুরী খবর পেয়ে তিনি চলে এসেছেন। নরহরিদা হবেন আমার পক্ষের ব্যারিস্টার।

নরহরিদা আসতেই ওঁর অমায়িক ব্যবহারে আর অসাধারণ ব্যক্তিত্বে সবাই খুশি।

নরহরিদাও আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কথায় কথায় তিনি বলছেন বিমল বাঁড়ুজ্যে এটা করেছে। বিমল বাঁড়ুজ্যে এই-ওই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি খুব লজ্জা বোধ করলাম।

এরপর হবু পাত্রীর পরিবেশনে মৃণালবাবু, কাকাবাবু, নরহরিদা ও আমি ভুরিভোজন করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললাম।

সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে বিকেল চারটা বেজে গেছে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর নরহরিদা মৃণালবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা এখানে কতোদিন থাকবেন?'

মৃণালবাবু উত্তর দিলেন, 'বেশীদিন থাকতে পারব না। অনেক কাজ ফেলে এসেছি।'

নরহরিদা বলেন, 'এখানে কিছু কিছু বেশ সুন্দর দেখবার জিনিস আছে। যার জন্যে বহু দূর-দূরান্তর থেকে অনেক লোক দেখতে আসে। ওইগুলো দেখবেন না?'

'দেখবার কি কি আছে?'

'এই ধরুন একদিকে লংতরাই পাহাড়। এ পাহাড়ের উপর অনেক অপূর্ব দেখার জিনিস আছে। ওইগুলো দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। যেমন—শিবমন্দির, মন্দির সংলগ্ন আছে একটা ডোবা। আরও আছে মাতৃযোনি, পাষাণ ফলক, নানান রং-বেরঙের বড় বড় পাথর। বেশ সুন্দর এক ঝরণা। আছে শস্য-ফলে পরিপূর্ণ জুম ক্ষেত। তারপর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো আছেই। এ পাহাড়ের উল্টোদিকে আছে সাখান পাহাড়। ওই পাহাড়ের উপরেও অনেক নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখবার আছে।

অনেক ভেবে চিন্তে মৃণালবাবু বলেন, 'তাহলে কাল আমাদের লংতরাই পাহাড়টাই দেখান। পরশু সকালে আমরা আগরতলা ফিরে যাব।'

নরহরিদা বললেন, 'বেশ তাই হবে।'

।। আঠার ।।

পরদিন।

নরহরিদার কথামতো মৃণালবাবু, কাকাবাবু, সুচিত্রা, আমি আর নরহরিদা চললাম লংতরাই পাহাড়ে।

আমার হবু শ্বাশুড়ী যাবেন না। তিনি বললেন, 'সুচিত্রার বাবা যখন যাচ্ছেন, আমার না গেলেও চলবে। ওঁর কাছ থেকে সব শুনে নেব। এ ছাড়া আমি ব্লাড প্রেসারের রোগী। পাহাড়ে ওঠার ধকল সহ্য করতে পারবো না।'

আমার মনে হয় এই সুযোগে একা একা আরেকবার তিনি গোমতীকে অন্তিম জেরা করে নিতে চান। অথবা গ্রামটি ঘুরে ঘুরে কোন মেয়ে মানুষ পেলে তার কাছ থেকে গোমতী এবং আমার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন কিনা চেষ্টা করবেন।

সকাল সকাল খুব ভাল করে মিষ্টি আর চা দিয়ে নাস্তা করে সকলে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি আর নরহরিদা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে কিছু মিষ্টি নিলাম, আর ফ্লাস্কে নিলাম দশ কাপ চা।

মৃণালবাবুর হাতে দুটো বাইনাকুলার। একটি দিয়েছেন কাকাবাবুকে আরেকটি নিয়েছেন নিজে। নিজের কাঁধে ঝুলানো আছে একটি দামী ক্যামেরা যার সাহায্যে রানিং ফটোও তোলা যায়।

মনুনদী পেরিয়ে সর্পিল আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ বেয়ে বেয়ে এক সময় আমরা সবাই লংতরাই পাহাড়ের ওপরে উঠে পড়ি।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারদিক চেয়ে সবাই বিস্মিত হয়ে গেছে।

কি সুন্দর লাগছে দুদিকের গ্রামগুলোকে। ওইগুলোকে দেখাচ্ছে খেলনার বাড়ির মতন। আর গ্রামের পথগুলোকে দেখাচ্ছে যেন কতকগুলো তালগাছ সমানে পড়ে আছে। কি চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। বেশ ভাল লাগলো সকলের।

হেঁটে হেঁটে প্রথমে সবাই শিব মন্দিরে এসে পৌছলাম। শিব-মন্দিরটি অপূর্ব লাগলো। চারিদিকে ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল-জাবড়ার মধ্যে মন্দিরটি বেশ অপরূপ দেখাচ্ছে। মন্দিরটির সামনে একটি অশ্বত্থ-বট বৃক্ষ বিরাট হয়ে বেড়ে উঠেছে। গাছটি এমন সুন্দর করে বেড়ে উঠেছে যে যা দেখলে মনে হবে বুদ্ধ গয়ার সেই বোধি বৃক্ষটির কথা, যেখানে সিদ্ধার্থ একদিন বুদ্ধত্ব লাভ করেছিল।

মন্দিরে শিবলিঙ্গ মূর্তি আছে। মন্দিরে পূজারী নেই। শুনলাম পূজারী নাকি এক নোয়াতিয়া উপজাতি। তিনি শিবচতুর্দশী উপলক্ষে এসে কিছুদিন শিবের পূজো দেন। বছরের বাকী দিনগুলোতে বাবা শঙ্করকে উপবাসে কাটাতে হয়।

মন্দিরটি ছিমছাম ছিল না। ধুলো বালির ঢলাঢলি।

হঠাৎ সুচিত্রা শিবলিঙ্গের সামনে বসে পড়েছে। দেড় হাজার টাকার বেনারসি শাড়ী পরে ধুলো-বালিতে বসতে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ করেনি ও।

ও নিমীলিত নেত্রে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে শিবের ধ্যান করতে শুরু করলো। গুন গুন করে গান গাইছে। জানা গেল না কি গাইছে। তবুও দু'একটা শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম ও মহাদেবের স্তব করছে। ও বোধ হয় শিবের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে, 'হে শঙ্কর, আমার বর যেন আপনার মতো সুন্দর, সুশ্রী ও সুঠাম হয়।'

জেগে-জেগে কি মধুর স্বপ্ন দেখছে সুচিত্রা। বুকের ভিতরটা এক স্বস্তির ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভরে উঠেছে ওর।

হঠাৎ মৃণালবাবু নরহরিদাকে বলেন, 'আপনারা সুচিত্রাকে নিয়ে আসুন। কি অপরূপ দৃশ্য! কি মন মাতানো রূপ! চোখ ফেরান যায় না। আপনারা আসতে আসতে কয়েকটা ছবি তুলে নিন।' এ কথা বলে কাকাবাবু সহ মৃণালবাবু এগিয়ে চললেন।

একটু পরে ভেসে এলো ক্যামেরার ক্লিক-ক্লিক শব্দ।

এদিকে চাপা আনন্দে উছলে পড়ছিলাম আমি। একান্তে পাবো

সুচিত্রাকে। সঙ্গীতবিশারদের কণ্ঠে গান শুনব। খুশির আবেগ আমার বুকের মধ্যে উথলে ভরে উঠল।

অনেকক্ষণ পর সুচিত্রা ধ্যান ভঙ্গ করলো। তারপর বলে উঠলো, 'চলুন ওঠা যাক।'

আমি ফিসফিস গলায় নরহরিদাকে বললাম, সুচিত্রাকে একটু অনুরোধ করুন না আমাদের একটা গান শোনাতে।

আমার কথা মতন নরহরিদা সুচিত্রাকে অনুরোধ করলেন একটা গান গাইতে।

সুচিত্রা গানে ওস্তাদ। তাই ভয়, কুণ্ঠা বা লজ্জা কিছুই নাই ওর। ও মৃদু হেসে সাবলীল গলায় বললো, 'কি গান গাইব ?'

নরহরিদা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কি গান গাইবে রে ?'

আমি নরহরিদাকে একটা চিমটি কেটে বললাম, 'গান শুনতে চাইলেন আপনি, আর আমায় জিজ্ঞেস করছেন কোন্ গান গাইবে ?'

নরহরিদা মুখের ওপর আমাকে লজ্জা দিয়ে ফিক করে হেসে বললেন, 'আর ন্যাকামি করতে হবে না। চট করে বলে ফেল, কোন্ গান গাইবেন।'

ধরা পড়ে গেলাম। আর কি করি !

আমার আর সুচিত্রার দৃষ্টির সংঘর্ষ হলো। ওর দু'চোখে বিস্ময়।

মাথা নত করে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় বললাম, 'মীরার ভজন।'

সুচিত্রা গেয়ে উঠলো :—

রাজরাণী মীরা ভিখারিণী
গিরিধারী তোমার লাগিয়া।
পথে পথে ফিরি উদাসিনী
হরিনাম ভিক্ষা মাগিয়া॥
লোকে বলে মীরা পাগলিনী
রানা বলে কুল-কলঙ্কিনী।

মীরা জানে প্রভু গিরিধারী
আনপথে আছে সে বসিয়া ॥
দেখা দাও দেখা দাও প্রভু গিরিধারী
মীরা কাঁদে তোমার লাগিয়া।
কাঁদায়োনা অভাগী মীরারে
আশাপথে আছে সে বসিয়া ॥

সুচিত্রা যেন একেবারে বাহ্যজ্ঞান ভুলে গিয়েছিল গানে তন্ময় হয়ে। কি অপূর্ব করুণ সুর। গানের প্রতি মোচড়ে যেন একটা বিষণ্ণ আকাঙ্ক্ষার প্রাণ ঢালা করুণ আবেদন। ওর চোখে-মুখে কি ভক্তিপূর্ণ তন্ময়তার শোভা ফুটে উঠলো গানখানা গাইতে গাইতে! তার গলার আওয়াজ অত্যন্ত ভারী হয়ে ওঠে, চোখ দুটো ছলছল করে, ঝরঝর ধারায় গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতন গানটা শুনলাম। আমার ইচ্ছে হলো এখন যদি একটা মালা পেতাম তাহলে তা সুচিত্রার গলায় আলগোছে পরিয়ে দিতাম। তখন মনে হতো এই মেয়েটিই সত্যিকারের মীরাবাঈ, অনেক কাল পরে পৃথিবীতে আবার নেমে এসেছেন, আবার সবাইকে ভক্তির গান গেয়ে শোনাচ্ছেন।

গায়িকার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও চোখের জল আটকাতে পারলাম না। দেখলাম আমাদের সকলের চোখ জলে চক চক করছে।

যখন গানের তন্ময়তা কেটে গেল তখন ভাবলাম এমন মিষ্টি গলা, এমন খুশি খুশি মিষ্টি চেহারা সকলের মনোরঞ্জন করবেই।

এবার নরহরিদার একান্ত অনুরোধে একখানা হিন্দী মীরা ভজন গাইলেন সুচিত্রা।

আবার আমরা তন্ময় হয়ে শুনলাম ওই গান। সকলের কানের ভুরিভোজন করে আমরা মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি।

সবাই একত্র হয়ে একটা গাছের ছায়ায় বসে চা-মিষ্টি খেয়ে নিলাম।

মন্দির সংলগ্ন দেখলাম পাথরের মেলা। দুটো বড় পাথরের

মাঝখানে একটা ডোবা। ওটা দেখতে একটা ছোট চৌবাচ্চার মতন। পাথরের গা ধোয়া জল এসে জমেছে ওই চৌবাচ্চায়। শুনেছি ওই জল খেলে নাকি যে কোন কঠিন রোগ সেরে যায়।

কিছুদূর এগিয়ে দেখতে পেলাম মাতৃযোনি। ওঁকে প্রণতি জানিয়ে আমরা আরও এগিয়ে গেলাম। তারপর চোখে পড়লো পাষাণ ফলক। দেখতে ভারী সুন্দর। কারুকার্যখচিত কি অপূর্ব ফলকগুলো! এরপর দেখলাম কি বিরাট বিরাট পাথর এখানে ওখানে পড়ে আছে।

তারপর আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলাম নানা জাতের গাছ-গাছালির গহন। গাছের মাথায় সূর্যের ছায়া পড়া সোনালী চুল। ওখানে দেখলাম ফুলের মেলা। অনেক ফুলের গন্ধ নেই। গুণ নেই, কিন্তু রূপ আছে। ফুল নয়তো, ফুলবাবু।

দুপুরের গমগম রোদে আরও খানিকটা এগিয়ে দেখলাম বেতবন আর বাঁশবন। পাহাড়ের ওপরের বেত গাছগুলো হাওয়ায় দুলছে। শিরশির করে শব্দ বেরুচ্ছে বাঁশবন থেকে। লম্বা লম্বা বেত-ডাঁটার ছায়ায় বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবল বাজছে অনেক গান।

বিভিন্ন দৃশ্য দেখতে দেখতে সবাই অভিভূত হয়ে গেলাম।

আরও কত নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা সবাই হাঁপিয়ে উঠলাম। হঠাৎ মৃণালবাবু সোনার হাত ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললেন, 'এগারোটা বেজে গেছে।'

কাকাবাবু বলে উঠলেন, 'চলুন এবার ফেরা যাক্।'

বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছি লংতরাই পাহাড়ের আনাচে কানাচে কত আশ্চর্য আপাতত তুচ্ছ অথচ বিস্ময়কর দৃশ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এতো শব্দ, এতো রূপ, এতো রঙ, এতো গন্ধ যে, যাদের কান, চোখ আর নাক আছে এবং অনুভব করার ক্ষমতা আছে, তাদের পক্ষে এতে বিহ্বল না হয়ে থাকা সম্ভব নয়।

আমরা যখন ডেরাতে পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে একটা।

॥ উনিশ ॥

কাল বিকেল তিনটায় সবাইকে নিয়ে মৃণালবাবু ছামনু ছেড়ে আগরতলা চলে গেলেন। যাবার আগে কাকাবাবু নরহরিদাকে বলে গেলেন বিয়ের তারিখ ঠিক করে ওঁরা আমাদের কিছুদিনের মধ্যেই জানিয়ে দেবেন।

মৃণালবাবু নরহরিদাকে বলে গেছেন আমরা যেন অন্ততঃ দু'বাস ভর্তি বরযাত্রী নিয়ে যাই। কম বরযাত্রী হলে নাকি ওঁদের প্রেস্টীজ থাকবে না।

নরহরিদা তাদের জানিয়ে দিয়েছেন এসবের জন্য ওঁরা যেন না ভাবেন। তাঁদের যাতে কোন সম্মানের হানি না হয় তার জন্যে আমরা সচেষ্ট থাকবো।

মৃণালবাবুদের যাবার পর থেকে গোমতী যেন কিরকম মনমরা হয়ে গেছে। হাসি নেই আহ্লাদ নেই। খুব বেশী দরকার না হলে কথাই বলে না। যতটুকু বলে তাও ভাববাচ্যে। যেমন, খেতে যাওয়া হোক্, প্রাতরাশের সময় চলে যাচ্ছে, চান করতে গেলে ক্ষতি কি, ইত্যাদি।

কাল রাতে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা বিরাট বাঘ ঢুকেছে এ তল্লাটে। একটা গরু নিয়ে গেছে হরচন্দ্র বড়ুয়ার। লোকটার অবস্থা ভালো নয়। একটা গরু ওর এক পুত্র সন্তানের মতন। ও কেঁদে-কেটে আকুল হয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে।

এখানে-ওখানে এ নিয়ে জটলা। আবার আজ রাতে কার উপর সওয়ার হয় বাঘটি!

টিন, কাঁসর, ঘণ্টা, লাঠিসোটা নিয়ে গ্রামবাসীরা এদিক ওদিক

ছুটোছুটি করছে। আবার কেউ ছুটছে পটকা বাজি যোগাড়ে। রাত জেগে বর্শা হাতে যার যার বাড়ি পাহারা দেবে সবাই।

মনু থানায় খবর দেয়া হয়েছে। ওরা বলছেন আবার বাঘটা এলে তাদের যেন সঙ্গে-সঙ্গেই খবর দেয়া হয়। রাইফেল দিয়ে বাঘটিকে সাবাড় করে দেবে ওরা।

তিনদিন পর আবার কাল রাতে বাঘটি ছামনু নদী পার হয়ে ঢুকেছিল ভেলেছ চাকমার বাড়ি। ভেলেছ চাকমা গত এক মাস ধরে বাড়ি নেই। কাজের খোঁজে গেছে সাথান পাহাড়ে। খালি বাড়ি পেয়ে বাঘটি ঢুকেছিল ওর বাড়ি। ভেলেছ চাকমার বউকে জখম করে ওর তিন বছরের মেয়েকে কামড়ে ধরে চম্পট দেয় বাঘটি।

দুদিন পর গেল রাতে টমকে বাঘে নিয়ে গেছে। টম হলো লম্বাছিরা চাকমার ছেলে তনিয়ার বড় প্রিয় কুকুর।

তনিয়া টমকে এনেছিল ছৈলেংটা থেকে। ওটা তখন দশ দিনের বাচ্চা। সাদা-লালে মিশানো রঙ, গাট্টা-গোট্টা বাচ্চাটিকে এনে অতি যত্নে লালন-পালন করেছে তনিয়া। টম বেশ বড় হয়েছিল।

তনিয়া যখন পাহাড়ে গরু চরাতে যেত তখন টম ছিল ওর সঙ্গী। টম সারাদিন তনিয়ার পিছু পিছু ঘুরঘুর করতো। পরিশ্রান্ত হয়ে তনিয়া যখন গাছে হেলান দিয়ে ঘুমোত, তখন টম ছিল অতগুলো গরুর রক্ষাকর্তা। কোন কোন গরু ঘাস-ঘুস খেতে খেতে এদিক-ওদিক চলে গেলে টম ঘেউ ঘেউ করে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসত।

টম তনিয়াকে দুবার সাপের ফণা থেকে বাঁচিয়েছিল, একবার বাঁচিয়েছিল রাম কুকুরের আক্রমণ থেকে। বাঘ-হাতির আক্রমণ থেকে টম বহুবার রক্ষা করেছে তনিয়াকে।

টমের চিৎকারের তারতম্য শুনে তনিয়া বুঝতে পারত কি জানোয়ার-টানোয়ার দেখেছে ও। বন্যশূয়োর আর হরিণ দেখলে ও

লম্ফ-ঝম্ফ দিয়ে তাদের তেড়ে ধরতে যেত। খরগোশ, বানর দেখলে ওদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিত। হাতি দেখলে গলা দিয়ে এক অদ্ভুত শব্দ বের করতো। আর বাঘের আঁচ পেলেই টম ভয়ে জড় সড় হয়ে পালিয়ে আসত তনিয়ার কাছে। তারপর ঘরঘরানি আওয়াজ করে তনিয়াকে হুঁশিয়ার করে দিত বাঘের আগমন সম্পর্কে।

পূর্ণিমার রাত-দুপুরে হঠাৎ একটা করুণ কুঁই-কুঁই শব্দে তনিয়ার ঘুম ভেঙে যায়। ও তার মাকে ডাকে। ঘুম থেকে উঠে ওরা শোনে টমের করুণ আর্তনাদ।

বাতিটা জ্বালিয়ে বাইরে আসতেই ওরা এক্টা বিশ্রী গন্ধ পায়। ভয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ওরা ঘরে ঢুকে পড়ে। জানালা দিয়ে দেখে বাঘটা টমকে মুখে পুরে চলে যাচ্ছে।

খানিক পর বাইরে এসে দেখে বারান্দার এক কোণে টমের জন্যে পেতে রাখা চটের বস্তাটা খালি পড়ে আছে। ওটাতে টম নেই।

লম্বাছিরা দুধ দিতে এসে আমায় বললো, গেল রাতের ঘটনাটি। আরও বললো আজ তনিয়া পাহাড়ে যায়নি, মনমরা হয়ে টমের জন্য কাঁদছে। কেঁদে-কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছে ও। দশদিনের বাচ্চাটিকে ও এতবড় করেছে—তাই।

লম্বাছিরা আরও বললো টম ছিল তনিয়ার বড় আপন সখা। তনিয়ার সঙ্গে ও পাহাড়ে যেত আবার পাহাড় থেকে আসত। টম ছিল তনিয়ার দিনভর সঙ্গী।

আমি জানি কুকুর এমনই জন্তু যে মনিবের চোখের চাহনি দেখে মনিবের কথা বোঝে। কুকুর মনিবের সুখে-সুখী এবং দুঃখে-দুঃখী। এ স্বার্থহীন—প্রত্যাশাহীন ভালবাসার সমতুল্য ভালবাসা খুব কম মানুষের কাছ থেকেই আশা করা যায়।

সারাদিন ধরে বর্শা হাতে তনিয়া সব টিলা-টঙ্করে, ঝোপ-ঝাড়ে, জঙ্গলে-জাবড়ায় খুঁজছে টমকে। ও জানে টমকে পাবে না, তবুও

খুঁজছে যদি টমের হাড়-গোড় কিছু পায়।

বেলা প্রায় পড়ে গেছে।

সবাই দেখলো প্রায় সবটুকু খাওয়া টমের পায়ে দড়ি বেঁধে তনিয়া হিড়হিড় করে টেনে বাড়ির দিকে নিয়ে আসছে। টমের সমস্ত দেহটা বাঘটি খেয়েছে, শুধু বাকী ছিল মুখ থেকে গলা অবধি অংশটা আর সঙ্গে মিশে আছে পিছনের পায়ের দুটো কঙ্কাল। আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না কুকুরটির। ভাল করে দেখলে চেনা যায় যে ওটাই টম। তনিয়া টমকে চিনেছে।

বাড়ির কাছে এসে তনিয়া বান্ধবীকে ডেকে কাঁদ কাঁদ গলায় বলে, 'দিদি টমকে নিয়ে এসেছি।'

বাইরে এসে সবাই দেখে টমকে। ওকে চেনা যায় না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তবে চিনল টমকে।

তনিয়া বান্ধবীকে বললো, 'একটা দা আর একটা কুড়োল নিয়ে আয় দিদি।'

বান্ধবী কৌতূহল নিরসনের জন্যে প্রশ্ন করে, 'দা-কুড়োল নিয়ে কি হবে রে ?

তনিয়া ধমক দিয়ে বলে, 'আন না। তারপর দেখবি কি করি।'

কুড়োল আর দা নিয়ে তনিয়া কিছু লাকড়ী সংগ্রহ করে একটা চিতা সাজিয়েছে। তারপর টমকে চিতায় তুলে আগুন ধরিয়ে ওটাকে দাহ করা হলো।

দাহ করার পর ওখানে পুঁতে দেয়া হলো একটা নিম গাছের চারা। ওই নিম গাছটিই হয়ে উঠবে 'টমের স্মৃতি।'

গত কিছুদিন ধরে বাঘটির কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নি।

আবার গত রাতে বাঘটি এসেছিল। এসে একটা গরু মেরেছে।

পরদিন সকালে দেখা গেল ছামনু নদীর এপারে গরুটাকে কিছুটা

খেয়ে তারপর ওটাকে নিয়ে নদী সাঁতরে ওপারে চলে গেছে বাঘটি। ওপারে আছে বাঁশের, বেতের এবং অন্যান্য নানান গাছ-গাছালির ঘন ঝোপ-ঝাড়। ওখানে বসে বসে বেশ আরাম করে গরুটাকে সাবাড় করেছে।

মনু থানায় খবর দেয়া হলো। এস. আই. শিশির পাল একজন সাহসী কনেস্টবল সহ একটা রাইফেল আর একটা বন্দুক নিয়ে সন্ধ্যের মধ্যে চলে এলেন ছামনুতে।

চাঁদনী রাত। একটা গাছের উপর মাচান করে পুলিশের লোকেরা বসে আছেন। গাছের নিচে রাখা হয়েছে একটা গাট্টা-গোট্টা গরু।

ডালপালা দিয়ে এমনভাবে ঘিরে রাখা হয়েছে মাচানটিকে, যাতে দূর থেকে বাঘের চোখে না পড়ে। গাছের ডালের কাটা অংশ মাটি দিয়ে ঘষে লেপে দেয়া হয়েছে যাতে রাতে সাদা অংশ দেখে বাঘ সন্দেহ না করতে পারে।

পুলিশের লোকেরা রাইফেলে আর বন্দুকে গুলি পুরে চুপচাপ বসে আছেন মাচানে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটতে লাগলো। কিন্তু বাঘটির দেখা নেই।

গভীর রাতে দেখা গেল বাঘটি ছামনু নদী পার হয়ে গরুটার কাছে আসছে। ওর চোখ দুটো শক্তিশালী দুটো টর্চের বাল্ব যেন। বাঘটি লাফ দিয়ে গরুটার ঘাড়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে তার গলায় দাঁত বসিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গরুটার ঘাড় ভেঙ্গে ফেলেছে। টস টস করে রক্ত পান করে মাতালের মতো হয়ে গেছে যেন বাঘটা।

এমনি সময় এক অকল্পনীয় অবস্থা। শিশিরবাবুর সঙ্গী কনস্টেবল হঠাৎ পা ফসকে গাছের ওপর থেকে পড়ে যায়।

তখন বাঘটি প্রচণ্ড গর্জন করে গরু ছেড়ে কনেস্টবলকে ধরার জন্য যেই লাফ দেবার উপক্রম করছে তখন শিশিরবাবুর রাইফেল থেকে বেরিয়ে এলো 'গুড়ুম-গুড়ুম-গুড়ুম।'

গুলি করার সঙ্গে-সঙ্গে বাঘটা শূন্যে ডিগবাজী খেয়ে একেবারে সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। শিশিরবাবু আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে সে বাঘটি মরেছে।

গাছের পাশে ছিল একটা প্রায় শুকনো ছড়া। গড়াতে গড়াতে ছড়ার মধ্যে পড়ে গেল কনস্টবল। মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ও। আর উপরে গুলি খাওয়া বাঘটা শুয়ে আছে।

কিন্তু খানিক বাদে শিশিরবাবুকে চমকে দিল বাঘটি। প্রায় পেটে ভর করে ওটা পালাবার জন্যে যেই লাফ দিতে যাবে এমনি সময় শিশির বাবুর রাইফেলের গুলি বাঘটির মগজ থেঁতলে দিলো সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ওটা দু'তিনবার হুমড়ি খেয়ে থরথরিয়ে কেঁপে একেবারে নিশ্চল হলো।

শিশিরবাবুর হর্ষোৎফুল্ল চিৎকারে লাঠি-সোটা-বর্শা হাতে মুহূর্তেই গাঁয়ের পাহাড়ীরা প্রায় সবাই এসে জড় হলো গাছটার নিচে। এসে দেখে বাঘটি মরে আছে আর ওদিকে কনেস্টবল বেচারা পড়ে আছে ছড়ার মধ্যে।

পুনর্জন্ম পেয়েছে কনেস্টবল। ওকে উঠানো হলো ছড়া থেকে। চোখে-মুখে, প্যান্টে-সার্টে কাদায় ভর্তি। বুকে-পিঠে-হাতে বেশ ব্যথা পেয়েছে কনেস্টবল। বাঁশের মাচানে ওকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো মনু হেলথ সেন্টারে।

॥ কুড়ি ॥

স্কুলে যাবার পর হেডমাস্টারবাবু আমায় ডেকে বললেন, 'বিমলবাবু, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে। ছুটির পর অবশ্যই আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন কিন্তু।'

বললাম, 'আচ্ছা স্যার।'

ছুটির পর যখন ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক সবাই চলে গেছে, তখন আমি হেডমাস্টার মশায়ের চেম্বারে ঢুকলাম। ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার স্যার?

চশমাটা নামিয়ে একটু থেমে হেডমাস্টারবাবু বললেন, 'আর বলবেন না। লম্বাছিরাবাবুর মেয়ে বান্ধবী আজ আট মাসের অন্তঃসত্বা। আর দেরী করা ঠিক হবে না। অরিন্দমের সঙ্গে বান্ধবীর বিয়ে দেয়াই ঠিক করেছি। জানাজানি হয়ে গেলে আর গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারব না। আমরা পদবীতে কারবারি। আমার বাপ-ঠাকুরদা গাঁয়ের সমাজপতি ছিলেন। সমাজের বিচার-আচারে ওঁদের ডাক পড়ত। এ-হেন সমাজপতির ছেলে-নাতি যদি সমাজে থেকে এ অনাচার বরদাস্ত করি তাহলে আমাকে সমাজ এক ঘরে করে তবে ছাড়বে।'

মুচকি হেসে বললাম, 'তাই করুন। যা দিনকাল পড়েছে, মনোমিলনে বিয়ে হওয়াই ঠিক। আপনাদের সমাজে তো বিবাহ-বিচ্ছেদেরও নিয়ম আছে। তাই ছেলে-মেয়েরাই পছন্দ করে বিয়ে করুক, ওটাই যথার্থ হবে।'

হেডমাস্টারবাবু আমার কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'যা বলেছেন। যাক্ এখন কাজের কথায় আসা যাক। আমার তো আর কেউই গার্জিয়ান নেই। সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে দেব। নতুবা আবার আরেকটা সমালোচনার মুখে পড়বো। তাই সমাজের যা নিয়ম আছে

ওইগুলো যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে। আমাদের সমাজে বিয়েতে বিভিন্ন মেজবান (সামাজিক অনুষ্ঠান) আছে। যেমন ধরুন, তিনবার বউ চাইতে হয় অর্থাৎ তিনবার কথার পর বিয়ে ফাইন্যাল হবে। আবার আমাদের মধ্যে বিয়ে হয় বরের বাড়ি। আমাকে অনেক ঝুট ঝামেলা পোহাতে হবে। তাই আমার অনুরোধ আপনি এ বিয়ের ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করুন।'

উদ্বেগের সঙ্গে বললাম, 'আমি তো আপনাদের সমাজের কোন নিয়ম কানুন জানি না।'

হেডমাস্টারবাবু সাবলীল কণ্ঠে বলেন, আপনার জানাজানির দরকার হবে না। ওইগুলো আমিই করব। আপনি শুধু আমাকে সঙ্গ দেবেন।

সোল্লাসে বলে উঠলাম, 'হ্যাঁ, তা পারব। উপরন্তু আমার লাভ, আপনাদের সমাজের আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন।'

বর্তমানে লম্বাছিরা চাকমার অবস্থা আগের চেয়ে অনেক স্বচ্ছল। ওর স্ত্রী পেতাঙ্গী নিজের তাঁত দিয়ে যে পিঁধন আর খাদি তৈরী করত, ওই ব্যবসা আজকাল বেশ রমরমা। ওর মেয়ে বান্ধবী ওকে সাহায্য করতে করতে হিমসিম খেয়ে যায়।

বাপ-বেটা ছামন্থু হাটে, ময়নামা হাটে পিঁধন আর খাদি বিকিকিনি করে বেশ দু'পয়সা পাচ্ছে।

লম্বাছিরা নিজের বলদ নিয়ে অন্যের বাড়িতে হাল দিয়ে রোজগার করছে কিছু। আর ওদিকে তনিয়া এখন আর নবকুমার বড়ুয়ার গরু চরাতে পাহাড়ে যায় না। ও এখন বনের ছন-বাঁশ কেটে এনে বেশ ভালই কামাই করছে।

আজ তেনমাং অনুষ্ঠান।

হেডমাস্টারবাবু আমাকে নিয়ে দুই কলস জোগরা (মদ), প্রচুর

পান সুপোরি আর তিন পাতিল মিষ্টি নিয়ে চলেছেন কনে বাড়ি।

বউচানা একপুর বৈধক (বিয়ের কথাবার্তার প্রথম বারের বৈঠক)।

কনের পিতা লম্বাছিরা চাকমা উঠোনে চাঁদোয়া টাঙিয়ে, সতরঞ্চি বিছিয়ে বেশ সুন্দর একটা বৈধকের ব্যবস্থা করেছেন। আর বাতানা (নিমন্ত্রণ) করেছেন গাঁয়ের কিছু গণ্যমান্য চাকমাকে। ওঁরা এসে বসেছেন বৈধকে।

বর অনিন্দ্যমের পিতা হেডমাস্টারবাবু, কন্যা বান্ধবীর বাবা লম্বাছিরা চাকমার কাছে বৈধকের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে জামেয়্যার (বিয়ের) প্রস্তাব উত্থাপন করলেন।

প্রস্তাবটি সোজাসুজি না করে ঘুরিয়ে করেছেন, এটাই নিয়ম। তাই হেডমাস্টারবাবু লম্বাছিরা চাকমার কাছে প্রস্তাব করলেন, 'আপনার বাড়িতে একটা সুন্দর গাছ আছে। এর ছায়াতে আমি একটা গাছের চারা লাগাতে চাই।'

এ প্রস্তাব থেকে কনের পিতা বুঝে নিয়েছে যে এটা জামেয়্যার প্রস্তাব। উপস্থিত সবাই বুঝে নিল ব্যাপারটা। খুশি খুশি মুখে অনেকের কণ্ঠ থেকে সুরেলা শব্দ বেরিয়ে এলো।

আরও কিছু মেজবান শেষ করে জোগরা খেয়ে মিষ্টি মুখ করে ধীরে ধীরে আজকের বৈধক শেষ হলো।

পাশেই গ্রাম তাই আমাকে নিয়ে হেডমাস্টারবাবু চলে এলেন নিজবাড়ি।

বউচানা দ্বিপুর বৈধকের আগে (বিয়ের কথাবার্তার দ্বিতীয় বার বৈঠকের আগে)।

এ সময় বরপক্ষ এবং কনে পক্ষকে কিছু সামাজিক ক্রিয়া কলাপ পালন করে দ্বিতীয়বার বৈঠকে যেতে হয়। এ সময় দু'পক্ষের কিছু শুভলক্ষণ এবং অশুভলক্ষণ বিচার করতে হয়। এগুলো হলো, যাতায়াতের সময় কোন লোককে দুধ, ফল-ফলাদি, মুরগী নিয়ে যেতে দেখা, ডানদিকে জল দেখা শুভলক্ষণ। চিল, শকুনী দেখা, বাঁ দিকে

কাকের রব শুনা শুভলক্ষণ। অনেকদূরে কনের বাড়ি হলে, কনের বাড়ি গিয়ে কথা বলার আগের দিন বরের অভিভাবক যদি স্বপ্নে বিছা অথবা কচ্ছপ দেখেন তাহলে অশুভ লক্ষণ। এসব শুভ-অশুভ লক্ষণ বিচার করে চাকমারা বিয়ের কথাবার্তার দ্বিতীয়বারের বৈঠকের ব্যবস্থা করে।

হেডমাস্টারবাবু এসব সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলো যথাযথ পালন করেছেন। তারপর আমাকে নিয়ে চলেছেন কনের বাড়ি। এবার সঙ্গে করে নিয়েছেন প্রচুর মদ, মোরগ, পান-সুপোরী আর পিঠে।

বউচানা দ্বিপুর বৈধক (বিয়ের কথাবার্তার দ্বিতীয়বারের বৈঠক)।

প্রতিবেশী কয়েকজন প্রাচীন চাকমাকে নিয়ে কনের পিতা কখাছিরা চাকমা বৈধকে বসে আছেন। বিভিন্ন মেজবান পালন করে কনেপক্ষ মেয়ে বিয়ে দিতে এবং বরপক্ষ মেয়ে গ্রহণ করতে রাজী হলো।

তারপর লেনদেন এবং চূড়ান্ত কথা বলার জন্য আরেকটা দিন ঠিক করা হলো।

খাওয়া-দাওয়া করে আজকের বৈঠকের ইতি টানলেন গাঁয়ের মুরব্বীরা।

কিছুদিন পর।

বউচানা তিনপুর বৈধক (বিয়ের কথাবার্তার তৃতীয় বারের বৈঠক)।

চূড়ান্ত বৈঠকও কনের বড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্দিষ্ট দিনে কনের পিতা গাঁয়ের কয়েকজন মুরুব্বীদের বাতান্যা করে বৈধকের ব্যবস্থা করেছেন।

আমাকে নিয়ে হেডমাস্টারবাবু এসেছেন ডেভাছড়ায় জ্যামেয়্যার ফাইন্যাল কথা বলার জন্য। নিয়ম অনুযায়ী সঙ্গে আছে একদল মিলা (স্ত্রীলোক)।

যথা সময়ে মুরুব্বীরা এসে বৈধকে বসেছেন। এ বৈধকে লেনদেন নিয়ে কথা বলতে হয়। কোন পক্ষের বিশেষ কোন কথা থকলে এ বৈধকে বলা যেতে পারে।

বৈধকে লোক দেখানো কিছু কথাবার্তা হলো। উভয় পক্ষই বিয়ে হয়ে গেলেই রক্ষা পেয়ে যায়, তাই এ সম্পর্কে কোন পক্ষের কোন বাক বিতণ্ডা নেই। নেই কোন বাড়াবাড়ি বা কথার কাটাকাটি। দরকার হলো না একশ এক কথার। অতি সহজেই লোক দেখানো লোকাচার আর মেজবান পালন করে বিয়ের কথা ফাইন্যাল হয়ে গেল।

এরপর মেজবানের অঙ্গ হিসাবে হেডমাস্টারবাবু আমাকে নিয়ে মেয়ে দেখলেন। কিছু অষ্ট অলঙ্কার দিয়ে ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন বরের পিতা।

এবার কনের পিতাকে বৈধকে বলতে হয়, 'তাহলে এখন উপযুক্ত জোগরা তৈরী করার হুকুম আছে।'

তাই লম্বাছিরা চাকমা দাঁড়িয়ে, করজোড়ে বৈধকের কাছে জোগরা তৈরী করার হুকুম চাইলেন।

বৈধকে সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ—আছে—আছে।'

এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কথা ফ্যাইন্যাল হয়ে গেল।

উভয় পক্ষের সুবিধামতো বিয়ের দিন ঠিক করলেন গাঁয়ের মুরুব্বীরা।

তারপর চললো খলামারনি। চললো নাচ-গান আর স্ফূর্তি। প্রায় ঘণ্টাখানেক বিভিন্ন মেজবানের পর সবাই মিষ্টি মুখ করে, জোগরা খেয়ে, পান-সুপোরী মুখে পুরে যে যার বাড়ি চলে গেল।

।। একুশ ।।

স্কুল ছুটির পর ডেরায় ফিরে চেয়ারে বসে আছি। অন্যদিন স্কুল থেকে এসে সোজা চান করতে চলে যাই। আজ কিন্তু চান করতে মোটেই ভাল লাগছিল না।

বেশ কিছুদিন ধরে একটু আনমনা হয়ে গেছি। কাকাবাবু অথবা মৃণালবাবুর কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র পাচ্ছি না।

কাকাবাবু নরহরিদাকে বলে গিয়েছিলেন সাত দিনের মধ্যে বিয়ে হবে। আজ দু'মাস হয়ে গেল কোন খবর নেই। কাকাবাবু কি আগরতলায় আছেন না বাংলা দেশে চলে গেছেন কিছুই জানলাম না। কেবলি মনটা আনচান করছে। আনন্দ যেন মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছে।

সুচিত্রা মেয়েটি বেশ সুশ্রী যদিও লেখাপড়ার দৌড় খুব বেশী নেই। কিন্তু গলাটা অপূর্ব। বেশ গায় মেয়েটি। লংতরাই পাহাড়ের উপরে যে 'মীরাভজন' গেয়েছিল, ওগুলো ভুলবার নয়। গানের সঙ্গে ভাবের অকৃত্রিম সমাবেশ। কাঁদতে কাঁদতে দু'চোখ ভাসিয়েছিল। ওই ভাবের অশ্রু দরদর ধারায় গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছিল মেয়েটির। সর্বোপরি ওর অনবদ্য রূপ। ওটা জগদ্দল পাথরের মতো মনের মধ্যে জেঁকে বসে আছে। কিছুতেই ছাড়াতে পাচ্ছি না।

গোমতীকে বললাম, 'একটু চা দে।'

গোমতী ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'চান করবেন না। শরীর-টরীর খারাপ করলো নাকি?'

নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললাম, 'না-না। শরীর ভাল আছে। মন ভাল নেই।'

অনুসন্ধিৎসু হয়ে গোমতী প্রশ্ন করে, 'কেন, কি হয়েছে?'

ঝাঁঝালো গলায় উত্তর দিলাম, 'গার্জেনগিরি ফলাতে হবে না।

এখন যা তাড়াতাড়ি চা নিয়ে আয়।'

সন্দিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে গোমতী। তারপর আর কোন কথা না বলে চা তৈরী করতে চলে যায়।

এত কথা, এত স্মৃতি, একটার পর একটা এসে হু-হু করে মনের মধ্যে ধাক্কা দিতে লাগলো। একটা আশায়-উদ্দীপনায় একটু বিহ্বল হয়ে পড়লাম।

কিছুক্ষণ পর গোমতী চা নিয়ে এল।

চা খেয়ে ক্লান্তি-দৈন্য-গ্লানি ঝেড়ে-ঝুড়ে তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছন্ন হয়ে গেলাম।

খানিক বাদে চান-খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। গোমতী ভাত নিয়ে ওর বাড়ি চলে গেছে।

মনটাকে কোন চিন্তার মধ্যে না জড়িয়ে হালকা করে রাখার চেষ্টা করলাম। উদ্দেশ্য, জোর করে ঘুমানো আর কিছুক্ষণের জন্য সব ভুলে থাকা।

কিন্তু চিন্তা জিনিসটা ধোঁয়ার মতন। ফাঁক-ফোঁকর পেলেই ঢুকে পড়ে। দমকা স্মৃতি ছুটেএসে বারবার ঘুমে বাধার সৃষ্টি করছে। তাই শত চেষ্টা সত্বেও ঘুমোতে পারলাম না।

একবার ডেরার গেটের বাইরে বেরুলাম ডাকহরকরা আসে কিনা দেখতে।

মাথার উপরে সূর্য। ওর খরতাপে পৃথিবী বুঝি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। তাই এক মুহূর্তের জন্যও সূর্যের দিকে তাকাতে পারলাম না। ফিরে এলাম ঘরে।

ঘড়িতে তখন দেড়টা। হাত, পা, মুখ ধুয়ে-মুছে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। না, ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বার কয়েক এপাশ-ওপাশ করলাম।

হঠাৎ ডাকপিয়ন এসে গেটের বাইরে থেকে জোর গলায় বললো, 'চিঠি'।

দৌড়ে খামে আঁটা লেফাফাটা নিয়ে এলাম। দেখলাম চিঠিটা এসেছে আগরতলা থেকে।

কাকাবাবুর পত্র। খুলে বেশ কয়েকবার পড়লাম। কাকাবাবু লিখেছেন মৃণালবাবু আর ওর স্ত্রী আমাকে তাঁদের জামাইরূপে পেতে খুব উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু বাধ সাধলো তাঁদের মেয়ে সুচিত্রা। ও বলেছে আমাকে তার পছন্দ হয়েছে কিন্তু ও আমাকে বিয়ে করবে না। আমার নাকি চাকমা মেয়েটার সঙ্গে অবৈধ প্রেম আছে। মা-বাবা বহু চেষ্টা করেও মেয়ের ওই ভুল শোধরাতে পারেনি। সুচিত্রার বান্ধবীকে দিয়েও ওর মা-বাবা অনেক চেষ্টা করেছেন, শেষে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন ওরা।

কাকাবাবু আরও লিখেছেন আমার বিয়ের জন্য নাকি এতোদিন বাড়ি ছাড়া। এখন বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় তিনি বাংলাদেশে চললেন।

কাকাবাবু চিঠির শেষে লিখেছেন আমি কোথাও বিয়ে ঠিক করে ওঁকে যেন জানাই। তখন তিনি এসে বধূকে আশীর্বাদ করবেন।

আমার দেহটা রিরি করতে লাগলো। মেয়েটাকে ধিক্কার দিলাম। মনে মনে মেয়েটার কার্যকলাপ নিয়ে কিছুক্ষণ স্মৃতিচারণ করলাম।

আমার অনুরোধে যখন ও গান গাইলো তখনই বুঝেছিলাম আমাকে ওর পছন্দ হয়েছে, তা না হলে অপছন্দ লোককে গান শোনাবে কেন? চাকমা মেয়েটার সঙ্গে ঘরসংসার পেতেছি, এ সম্পর্কে সরজমিনে তদন্ত করার জন্যে মা-মেয়ে-বাপ সবাই এলে তদন্তে আমি নির্দোষ প্রমাণিত হলাম। তবে কেন এ অনীহা, কেন এ বিয়ে ভণ্ডুল।

নারীচরিত্র রহস্য বিধাতার। আমাদের শাস্ত্রের সেই পঞ্চসতীর কথা মনে পড়ে। এত কিছু করেও ওঁরা সতী। আর আমি ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেও এক অবলা নারীর বিচারে হয়ে গেলাম অনির্মল চরিত্র। হায়রে! তোমাদের মন বুঝতে পারা বড়ই দুরূহ। পুরুষেরা কি করে তোমাদের মন বুঝতে পারবে! দেবতারাও তোমাদের মন

বুঝতে পারেনি। শাস্ত্রে আছে, 'দেবা ন জানন্তি কুত মনুষ্যাঃ।'

ভেবে-ভেবে মনটা যখন বিষিয়ে উঠেছে তখন গোমতীকে 'একটু ঘুরে আসছি' বলে হনহন করে বেরিয়ে পড়লাম।

কোথায় যাব কোন নিশানা নেই, নেই কোন গন্তব্যস্থল।

আমি ক্লান্ত-শ্রান্ত। তাই খুঁজছি বিশ্রাম। চাই একটু শান্তি।

ইতিউতি ঘুরছি। ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়লাম মানিকপুরে। উঠে পড়লাম উঁচু টিলাটিতে। নির্জন নিস্তব্ধ জায়গাটা।

পশ্চিম আকাশের রাঙা আলো টিলার উপরের নানান বৃক্ষের আগডালে-মগডালে ঠিকরে পড়েছে। এক লাল আভায় ভরে আছে পশ্চিম দিগন্ত। সূর্যের বিলীন হয়ে যাবার চোখ জুড়ানো রূপটি হৃদয় ভরে উপভোগ করলাম।

হঠাৎ শুনতে পেলাম ঢেউ খেলানো ছোট্ট টিলার উপর দাঁড়িয়ে সাত-আট বছরের একটি পাহাড়ী মেয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'সুনিয়া! এখনও বলছি ফিরে আয়। নইলে কান ধরে নিয়ে আসব আমি।'

সুনিয়া শুনলে না। কান নেড়ে-নেড়ে, দুলিয়ে-দুলিয়ে, নাচতে-নাচতে ছুটে ঢুকলো ঝোপ-ঝাড়, জঙ্গল-জাবড়ার মধ্যে। দড়ি বাঁধা গলার ঘণ্টা দুটো ঝুম-ঝুম করে বাজতে থাকে।

নীরব জনবিরল ওই টিলার প্রান্তে ছোট ছোট ঘণ্টার আওয়াজ ভারী মিষ্টি শোনাচ্ছিল। ধীরে ধীরে আওয়াজটা মিলিয়ে গেল।

সুনিয়াকে আর দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি ছুটলো ওই জঙ্গলের ভিতর। ওখান থেকে ধরে আনলো সুনিয়াকে। সুনিয়া অন্তঃসত্বা। তাই মেয়েটি সুনিয়াকে চোখে চোখে রাখে।

অদূরে কতকগুলো গরু-বাছুর হাম্বা-হাম্বা রবে টিলা থেকে নেমে গাঁয়ের দিকে এগোচ্ছে। পিছনে-পিছনে চলেছে কয়েকটি অর্ধ উলঙ্গ পাহাড়ী বালক।

সুনিয়া একটি ছাগলের নাম। মেয়েটি ছাগলটির গলায় ধরে অন্তরঙ্গ স্বরে বলছে, 'মরবে তুমি এবার সুনিয়া! কচি কচি পাতা

খাওয়ার লোভ একদিন বেরুবে।'

সারাটা পথ স্থনিয়াকে উপদেশ দিতে দিতে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলো। মেয়েটি ঝাঁঝের সঙ্গে বলছে, 'আজ বেশ কিছুদিন থেকে বাঘটির ভীষণ উপদ্রব। এর আগে ওই বাঘটি তিনটি গরু খেয়েছে। মুখে পুরে নিয়েছে একটি ছোট্ট মেয়ে। এখনও ওটা কোথায়ও ওৎ পেতে বসে আছে। তোমাকে পেলে ছাড়বে ভেবেছ?'

. মেয়েটির সব উপদেশ নিস্ফল করে দিয়ে, ছুট করে ছাগলটা আবার ওর হাত থেকে ছুটে গিয়ে কোথায় যে চলে গেল কে জানে।

বাড়ি ফিরে মেয়েটি দেখে মুনিয়া, ধনিয়া সব ফিরেছে, ফেরে নাই শুধু স্থনিয়া।

ওটাকে খুঁজতে খুঁজতে মেয়েটি আবার ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতে উত্তেজিত কণ্ঠে স্থনিয়ার উদ্দেশে বলে, এবার পেলে তোর একদিন আর আমার একদিন।'

মেয়েটি স্থনিয়াকে বড্ড বেশী ভালবাসে। ওটা তার সবচেয়ে বেশি প্রিয়। স্থনিয়াকে ডাকতে-ডাকতে মেয়েটি হয়রান হয়ে যায়।

এদিকে ডাকে, ওদিকে ডাকে, কোথায়ও পায় না স্থনিয়াকে। শেষে কি করবে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলেছে ওই টিলাটার দিকে।

এমনি সময় ওর মা পিছন থেকে ডাকলো, 'ওই লাংটি, স্থনিয়া ফিরেছে। সন্ধ্যে হয়ে এল বলে, তুই শীগগির বাড়ি ফিরে আয়।'

সন্ধ্যা হয় হয় দেখে আমিও নির্জন স্থানটিতে একলাটি থাকতে আর সাহস পেলাম না। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম ডেরার দিকে।

॥ বাইশ ॥

গত কয়েকমাস ধরে সেক্রেটারী ভগবান দেওয়ান মশায় বিভিন্ন রোগে ভুগছেন।

রাতে বেশ কয়েকবার প্রস্রাব করতে হয়। না করলে নয়। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরায়, যদিও এটা সব সময় হয় না। রাতে ঘুম হয় না, ভাত ঘুমের পর বাকী রাতটা জেগেই কাটাতে হয় ওঁকে। অন্যান্য লোক থেকে ওঁর জলের তেষ্টা অনেক বেশী। খাওয়া-দাওয়া করলেও কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই খিদে পেয়ে যায়। এসব বিভিন্ন রোগে ভুগে ভুগে ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায় ভগবান বাবুর।

প্রথম প্রথম এসব রোগকে তিনি বিশেষ আমল দেননি। একদিন গাঁয়ের এক সালিসীতে বসেছেন। সওয়াল চলছে। হঠাৎ ভগবানবাবুর মাথা ঘুরোতে শুরু করে। মাথার ভীষণ যন্ত্রণায় এখানে আর থাকতে পাবেননি। কয়েকজন লোক ওঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

সকলের পরামর্শে আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে গেলেন ভগবানবাবু। হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তারেরা ওঁর সমস্ত রোগের রিপোর্ট নিলেন। পরীক্ষা করানো হলো রক্ত আর প্রস্রাব।

বিভিন্ন ডাক্তারেরা পরামর্শ করে ভগবানবাবুর পলিইউরিয়া, পলিডিসপিয়া, গিডিনেস, ইনসমনিয়া, পলিফেজিয়া, ইমশিয়েশন ইত্যাদি সিম্পটমসগুলোর চিকিৎসা শুরু করেন।

ঘড়িব কাঁটা ধরে বিশদিন চিকিৎসার পর নীরোগ হয়ে যান ভগবানবাবু। ত্রিশ দিনের মাথায় তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন।

বিরাট প্রেসক্রিপশন লিখে ওঁকে ছেড়ে দেয়া হলো। এবং কড়া নির্দেশ দেয়া হলো কখনও যেন কোনভাবে তিনি উত্তেজিত না হন,

আর বারণ করে দেয়া হলো মিষ্টি এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য না খেতে।

প্রথম প্রথম নিয়ম মতো ওষুধ খেতে থাকেন ভগবানবাবু। কিন্তু কিছুদিন পর ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করেই কয়েকটা ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। কয়েকদিন যেতে না যেতেই কিছু পুরনো রোগ আবার উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। আগবতলায় যাব যাব করে বিভিন্ন কাজের চাপে আর যাওয়া হয়ে উঠেনি।

একদিন গাঁয়ের এক সালিসীতে বসেছেন তিনি। সঙ্গে আছেন আরও কয়েকজন গ্রাম্য মাতব্বর। বাদী-বিবাদীর সওয়াল চলছে। দুপক্ষই উগ্রচণ্ডী। কোন একটা কথা নিয়ে বিবাদীর সঙ্গে বাক-বিতণ্ডা শুরু হয় দেওয়ান মশায়ের। ওর অপ্রিয় ব্যবহারে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় শরীরের ওপর বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া। অকস্মাৎ চেয়ার থেকে পড়ে গেলেন দেওয়ানবাবু। হৈ-হুল্লোড় পড়ে যায় চারদিকে। ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসা হলো দেওয়ান মশায়কে।

মাথায় জলের ধারা চলছে। কিন্তু মাথা ঘুরনো কমছে না। পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে চৌচির হয়ে যাবে। সামনের লোকদের ঝাপসা দেখছেন দেওয়ানবাবু।

খানিক পর দেখা দিল বুকের বাঁ দিকে ব্যথা। ওই ব্যথা বাড়তে বাড়তে বাঁ হাতে প্রসারিত হলো। গা থেকে অতিরিক্ত ঘাম বেরুচ্ছে। ভীষণ দুর্বলতা অনুভব করছেন তিনি। মুখে জল দিলে থাকছে না। বমি করে সব ফেলে দিচ্ছেন।

সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটে গেল কৈলাসহরে। এলেন এক বড় ডাক্তার। ডাক্তারবাবু রোগীকে বিভিন্ন পরীক্ষা করলেন। বুকের বাম পাশে অসহনীয় ব্যথা। কিছুক্ষণ পর বমি। ডাক্তারবাবু প্রেসার মাপার যন্ত্র দিয়ে রোগীর প্রেসারটা নেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু দেওয়ানবাবুর 'ডায়াস্টলিক প্রেসারটা' আর রেকর্ড করা গেল না।

ওঁর এত প্রেসার উঠে গেছে যে ওই নম্বর যন্ত্রে নেই।

সঙ্গে-সঙ্গে ডাক্তারবাবু একটা ইন্‌জেকশন দিলেন। খানিক পর দেখলেন কোন পরিবর্তন নেই। রোগীর ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কথা সরছে না।

তখন ডাক্তারবাবু বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, 'ইট ইজ টু লেট।' একটু থেমে তিনি বলেন, 'যদি রোগীকে এখনি আগরতলা জি. বি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা যেত তবে স্যালাইন এবং অন্যান্য চিকিৎসা করে শেষ চেষ্টা করা যেতে পারত। কিন্তু এত দেরী হয়ে গেছে যে এখন সিফ্‌ট করা বিপজ্জনক।'

বিমর্ষ বদনে দক্ষিণা নিয়ে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর চল্লিশ মিনিট মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে অসংখ্য চাকমার রক্ষাকর্তা ভগবান দেওয়ান মশায় সকলের মায়া মমতা ত্যাগ করে চলে গেলেন ওপারে। যাবার আগে কোন কথা বলে যেতে পারেন নি। কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে।

ভগবানবাবুর বড় ছেলে বিধান চন্দ্র দেওয়ানের বয়েস ত্রিশ বছর। ওকে বিয়ে করিয়ে জায়গা-জমি বুঝিয়ে গেছেন বাবা। অন্যান্য ছেলেদের যাকে যা দেবার তাও ভাগ করে দিয়ে গেছেন। বর্ধিষ্ণু পরিবার, কোন ঝুট-ঝামেলা রেখে যাননি দেওয়ান মশায়।

সেক্রেটারীবাবুর এবম্বিদ খবর পেয়ে ছুটে আসি দেওয়ান বাড়িতে। এসে দেখি সব শেষ।

শোকে মুহ্যমান বাড়িটি। দেওয়ান মশায়ের মৃত্যুর খবরে মুহূর্তে বাড়িটা লোকে লোকারণ্য।

প্রয়াত সেক্রেটারীবাবুকে বাইরে আনা হয়েছে। তার চারপাশে আছে শোকসন্তপ্ত পরিবারের লোকেরা।

দেওয়ান মশায়ের স্ত্রী মাথা আছড়াচ্ছেন। চুল আলুথালু। চিৎকার করে কাঁদছেন তিনি। বহুক্ষণ কেঁদে কেঁদে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছেন প্রয়াত স্বামীর পায়ের নিচে। ছেলে-মেয়েরাও বাবার

চারদিক ঘিরে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে কেউ কেউ বাবা বাবা বলে কাঁদছে। কেউ কাঁদছে বিলাপ করে আবার কেউ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে আকুল।

যারা দেখতে এসেছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ কাঁদছে উচ্চরবে, আবার কেউ-কেউ আকাশ বিদারী বিলাপ ধ্বনি করছে। আবার কেউ-কেউ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে প্রয়াত দেওয়ানের মুখপানে।

চারদিকে শোনা যাচ্ছে কান্না-আর্তনাদ-বিলাপ আর উচ্চরোল।

এ দৃশ্য দেখে আমিও নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। চোখ দুটো দিয়ে দরদর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

একটু পর দেখলাম আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হেডমাস্টার মশায়। ওঁর চোখ থেকেও ঝরঝর করে জল ঝরছে। ওই বারিধারা যেন বিরামহীন, অবিরল।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন বলছেন, 'কাল বুধবার, তাই আমাদের সমাজের নিয়ম অনুযায়ী প্রয়াত দেওয়ানবাবুর অন্ত্যেষ্টি হবে না।'

হেডমাস্টারবাবুও ওই কথায় সায় দিলেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছে। আমাদের সমাজের বিধান অনুযায়ী বুধবার এবং শুক্রবার মৃতদেহ দাহ করা নিষিদ্ধ। এ ছাড়া আজকেও দাহ করা যাবে না কারণ প্রয়াত দেওয়ানকে অন্তিম দেখা দেখে যাবার জন্য আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের আসার সময় দিতে হবেই।'

তাই ঠিক হয়েছে কাল সারাদিন চাকমা সমাজের নিয়ম অনুসারে 'আগরতারা' ধর্মগ্রন্থ পাঠ করান হবে। এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সেরে আগামী বৃহস্পতিবার দিন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

দেওয়ান মশায়ের ইচ্ছানুযায়ী অভয়নগরের প্রাচ্য বিদ্যাবিহারের শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত মহাথেরকে দিয়ে 'আগরতারা' ধর্মগ্রন্থ পাঠ করানো হবে। তাই আজ রাতেই আগরতলায় লোক চলে গেছে যেন কাল ভোরেই মহাথেরকে ছামনু নিয়ে আসা হয়।

প্রয়াত দেওয়ানকে চান করিয়ে রাখা হয়েছে বাঁশ দিয়ে তৈরী 'সমরেং ঘরে'। পাশে রাখা হয়েছে একটা প্রদীপ। ধূপ-ধূনোও জ্বলছে।

বৃহস্পতিবার—ভোরবেলা।

আমি আর হেডমাস্টারবাবু খুব ভোরেই দেওয়ান বাড়ি পৌঁছে গেছি।

প্রয়াত দেওয়ানকে ভাল করে তেল সাবান দিয়ে চান করানো হলো। তারপর ওঁকে নতুন কাপড় পরিয়ে আলং (বাঁশের চাঙারির) উপর রেখেছেন।

প্রয়াত দেওয়ান যা যা খেতে ভালবাসতেন ওই সব ভাল ভাল খাবার আর ভাত দুটো পাত্রের মধ্যে নিয়ে ওঁর মাথা ও পায়ের কাছে রাখা হলো।

প্রয়াতের বুকের ওপর বড়ছেলে বিধানবাবু রাখলেন একটা রূপোর টাকা। তারপর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা একে একে ওঁর বুকের উপর টাকা দিতে শুরু করে। একে বলা হয় 'বুকের টাকা'।

মুহু মুর্হু ঢোল বাজতে থাকে।

যে দুটি পাত্র প্রয়াত দেওয়ানবাবুর মাথা এবং পায়ের কাছে রাখা হয়েছিল ওগুলো থেকে ভাল ভাল খাবার নিয়ে বাবার মুখে ছোঁয়ালেন বিধানবাবু।

তারপর সাতস্তবক করে লম্বা সূতোর একমাথা প্রয়াত ভগবান দেওয়ানের পায়ের কনিষ্ঠ আঙুলে এবং অপর মাথা একটা মুরগীর পায়ে বেঁধে দিলেন বিধানবাবুর ছোট ভাই। শুনলাম ওই সূতো কেটে মৃত এবং জীবিতের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন করবে ওরা।

খানিকপর দেখা গেল বিধানবাবু একটি তাগল (দা) হাতে উঠে দাঁড়িয়ে উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে বলে উঠেন, 'এখন মৃত এবং জীবিতের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার আদেশ দিন।'

সমস্বরে উপস্থিত সবাই বলে উঠেন, 'দিলাম, দিলাম।'

তখন বিধানবাবু তাগল দিয়ে এক কোপে সুতো কেটে দিলেন।

বাড়ির সামাজিক অনুষ্ঠান শেষ। সঙ্গে সঙ্গে ঢোল বেজে উঠল। এবার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রয়াত ভগবান দেওয়ানকে নিয়ে যেতে হবে।

কিছুলোক বাঁশের চাঙারিটি কাঁধে নিয়ে চললো শ্মশান ঘাটে। শবানুগমনে চলেছেন বহু আত্মীয় স্বজন আর বন্ধু-বান্ধব। অন্তিম যাত্রায় আমি আর হেডমাস্টারবাবুও চললাম।

পাঁচ থাক কাঠ দিয়ে চিতামঞ্চ সাজানো হলো। আরও কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শেষ করে প্রয়াত ভগবান দেওয়ানকে পুব দিকে মুখ করে শোয়ানো হলো পুত চিতায়। উপরে টাঙানো হয়েছে একটি চাঁদোয়া।

মুখাগ্নি করলেন বিধানবাবু। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সবার চোখ ছলছল। বাদ্যযন্ত্র থেকে করুণ অন্তিম সুর বেরিয়ে এলো।

আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। নিয়ম অনুসারে প্রয়াত ভগবান দেওয়ানের সঙ্গে একটা বাঁশ পোড়ানো হলো।

ওদিকে কেউ বাজী পোড়াচ্ছে। কেউ পুত চিতায় চন্দন কাঠ দিচ্ছে। আবার কেউ দিচ্ছে ধূপ। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষ না হওয়া অবধি এসব চলতে থাকে।

প্রায় চার ঘণ্টার পর ভাবগম্ভীর পরিবেশে গরীব গুবরোর বন্ধু ভগবান দেওয়ান পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন।

আরও কিছু মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পর বিধানবাবু বাবার অস্থি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

॥ তেইশ ॥

কাল হেডমাস্টারবাবুর ছেলের বিয়ে।

চাকমা সমাজের নিয়ম অনুযায়ী বরের বাড়িতে বিয়ে হয়। তাই ঝালাছড়ার হেডমাস্টারবাবুর বাড়িতে সাজসাজ রব।

আমাকে আর গোমতীকে হেডমাস্টার মশায় আগেই বাতান্যা (নিমন্ত্রণ) করে রেখেছিলেন যেন বিয়ের আগের দিন ওঁদের বাড়ি চলে যাই। তাই আমি আর গোমতী বিয়ের আগের দিন বালাছড়ায় পৌঁছে গেছি।

হেডমাস্টারবাবুর বাড়িতে এসে দেখি সমস্ত বাড়ি জুড়ে বিয়ে বাড়ির মেজাজ বিরাজমান। জোর কদমে সব কাজ এগিয়ে চলেছে।

বাড়িটা সুন্দর করে সাজিয়েছে। বাদ্যযন্ত্রও এসে গেছে।

ঢোল-ডগরা বাজানো হল। প্রথম ঢোলের আওয়াজকে বলা হয় 'খলামারনি'। চাকমাদের নিয়ম অনুসারে তখনই শুরু হয়ে যায় বিয়ের উৎসব।

পাশাপাশি চাকমা জোয়ান-জোয়ানীরা শুরু করেছে নাচ-গান। এটা বিয়ের এক বিশেষ অঙ্গ।

শুরু হয়ে গেছে বিভিন্ন মেজবান (সামাজিক অনুষ্ঠান)। মেজবানের বন্যা বয়ে চলেছে সমস্ত বাড়ি জুড়ে।

মিলারা (স্ত্রীলোকেরা) কলার খোল দিয়ে নঅ (নৌকো) তৈরী করছে। পান-সুপোরী দিয়ে দুটো পুঁটলি সাজিয়ে নৌকোতে রেখেছে ওরা। তারপর ওইগুলো নিয়ে চলেছে ছামনু নদীতে খুশিখুশি মনে মিলারা। ওরা নৌকো দুটোকে ভাসিয়ে দিয়েছে নদীতে।

মিলাদের পিছন পিছন আমিও গেলাম। একপাশে দাঁড়িয়ে আছি আমি।

ওরা বলাবলি করছে নৌকো দুটো যদি পাশাপাশি ভাসে তবে বুঝতে হবে বর-কনের জীবন সুখের হবে। আর যদি নৌকা দুটো পাশাপাশি না ভেসে একটা থেকে অন্যটা দূরে সরে যায়, তবে বুঝতে হবে ভাবি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ লাগবার সম্ভাবনা থাকবে।

আমরা সবাই দেখলাম নৌকো দুটো হেলে-দুলে পাশাপাশি ভেসে চলেছে।

মিলারা খুশি হয়ে সুরেলা শব্দ করতে করতে বাড়ি ফিরে এলো।

ঢোলের আওয়াজ থেকেও ভাবি দম্পতির শুভাশুভ ফলাফল নির্ণয় করতে চেষ্টা করছে চাকমা রমণীরা। ঢলাঢলি করে একে অন্যকে বলছে বর-কনের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে গো।

এরকম আরও অনেক মেজবান শেষ করে আজকের অধিবাস উৎসবের ইতি টেনেছে।

আজ বিয়ে।

বিয়ে বাড়ি সরগরম।

বর-কনে উভয় বাড়িতে চুঙ্গুলাং পূজো হয়েছে। এ পূজোতে উৎসর্গ করেছে একটি শূকর আর চারটি মোরগ। এ পূজো করেছেন অজা (চাকমাদের পুরোহিত)।

বরের বাড়িতে এ পূজো হবার পর কনেকে উঠিয়ে আনতে চলেছে অনেক পাহাড়ী। হেডমাস্টারমশায় দুজন বয়োবৃদ্ধ চাকমা-সহ কিছু লোককে এ কাজের জন্য আগেই নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। নিয়ম অনুযায়ী একজন কুমারী মেয়েও চলেছে কনে আনতে। কনে আহ্বানকারীরা সঙ্গে নিয়েছে কনে সেজে আসতে কিছু কাপড় চোপড় আর গহনাপত্র।

ওদের পিছন পিছন চলেছে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বেশ কিছু লোক। সঙ্গে নেচে-গেয়ে মাতোয়ারা হয়ে চলেছে কয়েকজন যুবক-যুবতী। আনন্দের ফোয়ারা সমস্ত পথ জুড়ে।

কনে আহ্বান কারীরা বিভিন্ন গাঁ বেয়ে বেয়ে এক সময় এসে পৌছেছে ডেভাছড়ার লম্বাছিরা চাকমার বাড়ি।

বাড়িটা সাজানো-গুছানো হয়েছে। এখানে বিয়ে বাড়ির মেজাজটা যেন একটু নিষ্প্রভ। কিন্তু নাচ-গানের কমতি নেই।

কনের পিতা লম্বাছিরা চাকমা সেজে-গুজে এগিয়ে এলেন। অভ্যর্থনা জানালেন বরপক্ষকে। কুমারী মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন ঘরে।

মেয়েটি কনের মার হাতে তুলে দিল একটা সুটকেশ। এতে আছে কনের পিংধন (পরিধানের বস্ত্র), খাদী (বুকে বাধবার কাপড়), খবং (মাথায় পরবার বস্ত্র), অষ্ট অলঙ্কার (গয়নাপত্র) আরও কিছু সাজবার জিনিসপত্র।

মঙ্গলঘট বসানো হয়েছে।

একজন পাহাড়ী মহিলা ঘরের সামনে সাতগুণ করে সুতো টাঙিয়ে দেয়। এটাকে বলা হয় সাঁকো। সেজেগুজে কনের মা এসে ওই সুতো ছিঁড়ে দিলেন।

এবার বরপক্ষ কনে নেবার অধিকার পেল। আর পরিবারের সকলের সঙ্গে কনের সম্পর্ক আর রইলো না।

এরপর আরও কিছু মেজবান সেরে কনে সাজে সেজে ফোলা ফোলা চোখে বান্ধবী ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ওকে এখন বিদায় দেবার পালা।

বাদ্যযন্ত্র থেকে করুণ সুর বেরিয়ে এল। পরিবারের লোকেরা আর প্রতিবেশীরা কাঁদছে।

কয়েকজন যুবতী কেঁদে কেঁদে বিদায়ের গান গেয়ে চলেছে।

সুবারি কাবি খানে খান,
উদে মন্‌নূন নানা গান।
ছরমা কুরারে কি খুদ দিম,
উদাসী মনেরে কি বুঝ দিম।

[সুপোরী টুকরো-টুকরো করে কাটছে,
আমাদের মনে নানান গান উঠছে।
বাচ্চাসহ মুরগীকে কি খাবার দেব,
আমাদের ব্যথিত মনকে কি করে সান্ত্বনা দেব।]

গান শোনে কনে বান্ধবী ডুকরে কেঁদে উঠে। ওর মা-বাবা বিলাপ করে কাঁদছে। আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীরাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে আকুল। একটা করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে সমস্ত বাড়িময়।

বান্ধবী চলেছে শ্বশুর বাড়ি। মা-বাবা, আত্মীয় পরিজন সহ ওকে কিছুদূর এগিয়ে বিষণ্ণ মনে সবাই ফিরে আসে বাড়ি।

কনের সঙ্গে চলেছে কনের ছোটভাই তনিয়া আর কিছু গণ্যমান্য প্রাচীন প্রতিবেশী।

বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে-বাজিয়ে, নাচে-গানে সোরগোল করে করে অনেক গাঁ মাড়িয়ে কনেকে নিয়ে সবাই ঠিক সময়ে চলে এলো বরের বাড়ি।

বরের বাড়িতে চললো অনেক মেজবান। পরে কনে বান্ধবীকে বসানো হলো বিয়ে মণ্ডপে।

কিছুক্ষণ পর বরসাজে সেজে অরিন্দমও এলো বিয়ের আসরে।

কনে বসেছে বরের বাঁ দিকে।

বরের পিছনে বসেছেন ছায়েলা (একজন পুরুষ) আর কনের পিছনে বসেছেন ছায়েলী (একজন রমণী)।

ভিক্ষু এসে গেছেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম মতে বিয়ে মন্ত্র পাঠ করাবেন। ওঁর কাছ থেকে জোড় বাঁধার অনুমতি নিয়ে ছায়েলা ও ছায়েলী একখণ্ড সাদা কাপড় দিয়ে জোড় বাঁধলেন।

ভিক্ষু ওদের বিয়ের মন্ত্র পাঠ করাতে শুরু করলেন।

এদিকে শুরু হয়ে গেল বাজী পোড়ানো। ওদিকে বাদ্যযন্ত্র থেকে ভেসে এল বিয়ের গানের সুর। ওই বাদ্যযন্ত্র থেকে উঠে ডিমিডিম রব। কখনও উঠে দ্রুতলয় আবার কখনও ধীরলয়। বিয়ে উৎসবের বন্যা বয়ে চলেছে।

পাশাপাশি গাঁয়ের যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে অবিরাম নেচে গেয়ে চলেছে। ওরা নাচে-গানে মশগুল।

ওরা গায় ঃ—

গুলা পারি জগনা,
মাহ্ ফুলে তুলি গরং তবনা।
কাত্যা বেদ বের বুনি,
সালাম জানেলং চেরকুনি।
ফুলে তুলি আলাম ছ্যং,
মুই প্রভুরে সালাম ছ্যং।
গরু বানিলুং কাজিলা,
স্বর্গতুম মাহ্ এল সাজিলা,
তাগল ধারেই খর শিনত,
সরস্বতী বজব্রিম জিলত,
খারিলা মেই কালাম ছ্যং
বসুমতি উদিজে মুই আছ,
গারি গারি সালাম ছ্যং,
জাদি পুজাত তং গুরি,
সৃষ্টি পথম ইচ্চে মুই তুলিলুং,
ধেলা নাগোর লং ধুরি,
ছড়াং ছিলুং চেই গধা—
এবে বব দিবদে লক্ষ্মী মা।
! আমি জগনা ফল আহরণ করি,
ফুল দিয়ে মাকে তপস্যা করি।
বেত দিয়ে ঝুড়ি তৈরী করি,
চারদিকে নমস্কার জানাই।
ফুলের মালা দিয়ে আমি,
প্রভুকে প্রণাম জানাই।

দড়ি দিয়ে গরু বাঁধা হয়,
মা স্বর্গ থেকে নেমে আসলেন,
ক্ষুরধার পাথরে দা ধার দি,
সরস্বতী আমার জিহ্বায় বসুক,
গাছে খারি কালাম (ঠেস) দিয়ে নেয়,
আমি পৃথিবীর মধ্যে আছি,
গড় হয়ে প্রণাম জানাই,
জাতি পূজোতে ভাতের টিলা করা হয়,
সৃষ্টির প্রথমে গাইতে ও আমি,
শাখা-প্রশাখা নিয়ে শুরু করলাম,
ছড়াতে বাঁধ দিলে যেমন জল ফুলে উঠে—
লক্ষ্মীর কৃপায় আমার জীবনও ফুলে উঠবে।]

এক সময় বিয়ে হয়ে গেল।

এবার বরকণে ঘরে এসেছে। চললো নানান মেজবান।

কাপড়ে গেরো দিয়ে বরকনেকে এক থালায় ভাত, ডিম, কলা ইত্যাদি দেয়া হলো। এ মেজবানের নাম 'বদাগুল্যা ভাত।'

থালা থেকে ভাত, ডিম নিয়ে বান্ধবী অরিন্দমের মুখে ডান হাতে আর অরিন্দম বান্ধবীর মুখে বা হাতে তুলে দেয়। পান বানিয়ে এগিয়ে দেয় কেউ। দুজনে-দুজনের মুখে পুরে দিয়েছে পান।

হাসি-মশকরা চলেছে পুরোদমে। বাদ্যযন্ত্রও থেমে নেই।

এবার পাড়া-পড়শী আর অরিন্দমের ছোট আত্মীয়-স্বজনেরা এগিয়ে এসেছে কিছু বাহনা (ধাঁধা) নিয়ে। পরীক্ষা করবে ওরা বর-কনের বুদ্ধির দৌড়।

চলবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। এ লড়াই হাতাহাতি নয়, মুখে-মুখে। অর্থাৎ বাকযুদ্ধ।

হাসি ঠাট্টা তো আছে। আনন্দে সবাই মশগুল। স্ফূর্তির ফোয়ারা ছুটেছে সমস্ত ঘর জুড়ে।

একজন কনেকে জিজ্ঞেস করছে ঃ—

গাছ ওইয়ে চক্কর,
পাদা ওইয়ে শেল।
যে ভাঙিৎ ন পারে,
তার গুত্তি সুদ্দা গেল।
[গাছটা চক্রাকারে উঠে,
তার পাতাগুলো শেলের মত।
যে বলতে পারবে না,
তার গোষ্ঠীতে জন্ম বৃথা।]

কনে পারেনি। ওকে উত্তর বলে দেয়া হলো। উত্তর হলো 'খেজুর গাছ'।

আরেকজন বরকে জিজ্ঞেস করছে ঃ—

কাজালঙ্কে ভেক ভেক্যা,
পাগিলে সিন্দুর।
যে ভাঙিৎ ন পারে,
তার গুত্তি সুদ্দা উন্দুর।
[কাঁচা থাকতে নরম,
পাকলে সিন্দুরের মতো হয়।
যে বলতে পারবে না,
তার গোষ্ঠী সব ইন্দুর।]

বর বুক সটান করে দরাজ গলায় বলে উঠলো, 'মাটির পাতিল।'

একজন কনেকে জিজ্ঞেস করছে ঃ—

ফেলেলুং গুল মরিচ,
উদিলাক বিরিছ গাছ ;
ধরিলাক বোয়ালা.
বজর বারমাচ।

[গোলমরিচ লাগিয়েছি,
উঠেছে বিরিচ গাছ,
তাতে বোয়াল ফল ধরলো,
বারমাস ধরেছে।]

কনে পেরেছে। ও বলে ফেলে, 'পেপে গাছ।'

আরেকজন বরকে জিজ্ঞেস করছে :—

ছিদিলাং কাল্যাজিরা,
উদিলাক সরক চারা,
ফুদিলাম মালতী ফুল,
ধরিলাক করঙা।

[কালাজিরে ছড়িয়ে দিয়েছি,
সরক চারা (গাঁজা) উঠল ;
তাতে মালতী ফুল ফুটল,
ওটা করঙা ফলে পরিণত হলো।]

বর পারলো না। ওকে উত্তর বলে দেয়া হলো। উত্তর হলো 'সরিষা'।

ঘরটা সরগরম। হাসি-ঠাট্টা চলেছে উচ্চরবে। বাদ্যযন্ত্র ও মাঝে-মাঝে বেজে উঠছে দ্রুতলয়ে।

এরপর বর-কনেকে ঘিরে চলছে নানারূপ হাসি মশকরা।

প্রাচীন চাকমা মহিলারা গল্প-গুজব করে অনেকক্ষণ ধরে। নাচ-গানও চলেছে।

অনেক রাত অবধি ঘরটা সরগরম ছিল। কিন্তু এক সময় সবাই অপার আনন্দ উপভোগ করে যে যেখানে পারে শুয়ে পড়ে।

বরকনে ঠাঁই বসে আছে। ওরা যেন বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী হয়ে বিচারকের কাঠগড়ায়।

এক সময় বর কনে তাকিয়ে দেখে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। দিগন্তের তীরে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে একমনে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে খেলা করছে তাদের আলুথালু চুল, পিঁদন আর খবং নিয়ে।

শুকতারার আলো ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসে। একটা অস্ফুট আলোর রেশ ফুটে উঠল পূর্ব দিগন্ত জুড়ে। ক্রমে ক্রমে বিকশিত হতে লাগলো সেই আলো।

অজা এসে গেছেন।

বরকনে চলেছে ছামনু নদীতে। তখনও গাঁয়ের কেউই ঘুম থেকে উঠেনি। এটাই নিয়ম।

জল ও মদ দিয়ে ওদের শুদ্ধ করিয়েছেন অজা। মন্ত্র বলতে থাকেন অনেকক্ষণ। তারপর বর কনে স্নান করে ফিরে এসেছে বাড়ি। এ অনুষ্ঠানকে বলা হয় 'বিয়াবুর' অথবা 'বুরপারন'।

ঢোল বাজানো হল। বর কনে যে ঘর থেকে এখনি বের হয়ে গেল ওই ঘর থেকে অনেক মেয়ে-পুরুষ হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে গেল। ওদের চোখ লাল লাল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে যে যার বাড়ি চলে যায়।

বিয়ের তিনদিন পর।

আজ হলো 'সুইদ ভাঙান' অথবা 'বউ বেড়ান।'

অরিন্দম বান্ধবীকে নিয়ে চলেছে শ্বশুরবাড়ি।

সানাই এলো। এলো বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র। বাজী পোড়ালো। মদের ফোয়ারা ছুটাল। বিরাট এক ভোজ দিলেন লম্বাছিরা চাকমা। চুটিয়ে চললো আমোদ, আহ্লাদ আর স্ফূর্তি।

॥ চব্বিশ ॥

গতকাল প্রয়াত দেওয়ানের কাষ্টকর্ম (অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া) সম্পন্ন হবার পর ওঁর হাড়করা (অস্থি) এনে রাখা হয়েছিল।

আজ হাড়করা বিসর্জন দেবার পালা।

তাই প্রয়াত দেওয়ানের বড়ছেলে বিধানবাবু একটি নতুন পাতিলে হাড়করা পুরে চলেছেন ছামনু নদীতে। পাতিলের উপরে রাখা হয়েছে একটি নতুন কাপড়। নদীর পারে এসে পিতার উদ্দেশ্যে প্রণতি জানিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছেন হাড়করা পূর্ণ পাতিলটি।

বিধানবাবুর কাকা জলে নেমে নিজের আঙুলের কড়ে সুতোর এক মুখ জড়িয়ে নেন, আর অন্য মুখটা বিধানবাবুর জেঠা নদীর পারে ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পর বিধানবাবুর কাকা জলে ডুব দিয়ে হাড়করা পূর্ণ পাতিলটি আরেকটু দূরে ঠেলে দিয়ে দাদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে জল থেকে উঠে আসেন।

সাতদিন পরের কথা।

আজ 'সাতদিন্যা' (শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান)।

আগরতলা, গৌহাটি এবং বাংলাদেশ থেকে পাঁচজন ভিক্ষুককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ওঁরা এসেছেন আগের দিন রাতে।

আমি আর হেডমাস্টারবাবু যথাসময়ে দেওয়ান বাড়ি পৌঁছে গেছি।

বাড়িটা বেশ সুন্দর করে সাজানো-গুছানো হয়েছে। চাঁদোয়ার নিচে বসেছেন ভিক্ষুরা।

ছয়দিন অশৌচ পালনের পর মাথা মুণ্ডন করে প্রয়াত দেওয়ানের ছেলেরা ভিক্ষুদের সামনে বসেছেন।

সমস্ত বাড়িময় একটা শান্ত এবং শুচিতাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে।

শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু সাতদিন্যা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করাবেন।

প্রয়াত দেওয়ান যে সব জিনিস খুব বেশী পছন্দ করতেন ওই রকম জিনিস কিনে এনে প্রয়াতের আত্মার সদ্গতির জন্য বিধানবাবুকে দিয়ে মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে উৎসর্গ করালেন ভিক্ষু। বড়ছেলে মন্ত্র পাঠ করে আরও প্রচুর উপাচার দান করলেন ভিক্ষুদের। অন্যান্য ছেলেরাও পিতার উদ্দেশে আরও কিছু ভিক্ষুদের দান করলেন। দান উৎসব চললো একটার পর একটা। বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু।

ওদিকে অন্যান্য ভিক্ষুদের মধ্যে কেউ 'মঙ্গলসূত্র' পাঠ করলেন। কেউ পাঠ করলেন 'রতনসূত্র' আবার কেউ ত্রিশরন মন্ত্রসহ পঞ্চশীল দান করলেন। এভাবে সমস্ত বাড়ি জুড়ে বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান চললো একের পর এক।

বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সেরে পরিবারের লোকেরা চললো শ্মশানে যেখানে প্রয়াতের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

ওদের সমাজের নিয়ম অনুযায়ী পরিবারের সবাইকে আজ দাহস্থানে জল ঢালতে হবে।

ভগবানবাবুর মৃত্যুর পরদিন থেকে ওঁর স্ত্রী অসুস্থ। শ্রাদ্ধের দিন ওঁর জ্বর প্রায় ১০৪ ডিগ্রী। তিনি শ্মশানে যেতে অপারগ। কিন্তু আজ ওঁকে দাহস্থানে জল ঢালতেই হবে। তাই শ্মশানে একটি জলপূর্ণ কলস নেয়া হলো। কলসের গলায় বেঁধে দেয়া হলো একটি সূতোর মাথা আর অপর মাথাটি টেনে নিয়ে আনা হলো বাড়িতে। ওই সূতোর মাথাটি দেয়া হলো প্রয়াতের স্ত্রীর হাতে। তিনি সূতোটি ধরে থাকলেন। আর ওদিকে বিধানবাবু দাহস্থানে জলপূর্ণ কলসটি ঢেলে দিলেন। বিধানবাবুতো আগেই জল ঢেলেছেন। এখন আবার জল ঢাললেন মার প্রতিভূ হিসেবে।

এবার আর সবাই দাহস্থানে জল ঢেলে বাড়িতে ফিরে গেলেন।

এখনি শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত মহাথের 'আরেনতামা তারা' নামক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করবেন। মাইক ওঁর সামনে। তিনি জলদ গম্ভীর কণ্ঠে পাঠ শুরু করে দিয়েছেন।

আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনে যাচ্ছি ধর্মগ্রন্থের সুর-লহরী। ওটা পালিভাষায় রচিত, তাই আমরা সব কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। অবশ্য মহাথের কথা দিয়েছেন পাঠ শেষ হলে এর বাংলা অনুবাদ করে আমাদের শোনাবেন তিনি।

প্রায় চার ঘণ্টার পর ধর্মগ্রন্থ পাঠ শেষ হলো।

ঢোল বাজান হলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে। আমরা প্রায় তিনশ জাতি-উপজাতি লোক চাঁদোয়ার নীচে সতরঞ্চিতে বসে আছি।

এক সময় মাইকে ঘোষণা করা হলো এখনি শ্রীমৎ বুদ্ধদত্ত মহাথের 'আরেন তামা তারার' বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করবেন।

মাইকের সামনে মহাথের গুরুগম্ভীর গলায় বলতে শুরু করেন, 'উপস্থিত শোতৃমণ্ডলী, চাকমা সমাজে প্রায় আটাশটি ধর্মগ্রন্থ আছে। ওইগুলো হলো আগরতারা, আরেনতামা তারা, সাম্ভিং গিরিতারা, অনিজ্ঞাতারা, আঙরাসূত্রতারা, তাল্লিকশাস্ত্রতারা ইত্যাদি। এগুলো চাকমা সমাজের নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে 'আরেনতামা তাবা' পাঠ করলাম। এ ধর্মগ্রন্থ বিরাট। তাই এর ঠিক ঠিক বাংলা অনুবাদ না করে সংক্ষেপে এ কাহিনীটি বলছি।

'কোন এক সময় ভিক্ষুগণ ধর্মসভায় বসে একে অন্যকে বলছেন. 'ওহে বন্ধুগণ, দেখুন শাস্তার দানশীলতার প্রভাব। উনি ওই দানশীলতার দ্বারা দেবতা এবং মনুষ্যদের আর্য মার্গ দেখাচ্ছেন।'

এমনি সময় শাস্তা ওখানে এলেন। বুদ্ধাসনে বসে মৃদু হেসে ভিক্ষুদের জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসে কি বিষয় নিয়ে আলাপ করছ ?'

ভিক্ষুগণ তাঁদের আলোচ্য বিষয় তথাগতের কাছে নিবেদন

করলেন। তা শুনে শাস্তা বললেন, 'কেবল এখন নহে, আগেও আমি দানকর্মে অতৃপ্ত ছিলাম।

ভিক্ষুগণ শাস্তার কাছে ওই কাহিনীটি বলার জন্য অনুরোধ করলেন। তখন তিনি বলতে শুরু করলেন 'অরিন্দম আখ্যান।'

'অনেক আগে শুচিনগরে অরিন্দম নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। ওঁর ষোল হাজার মহিষী ছিল। তাঁদের মধ্যে সুবর্ণগর্ভা ছিলেন প্রধানা মহিষী। রাজা প্রতিদিন প্রচুর দান করতেন। উপস্থিত প্রার্থীকে দান করতে দৈনিক ব্যয় হতো রাজার ছয়লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা।

একদিন প্রত্যুষে রাজা অরিন্দম ঘোষণা করলেন যে আজ তিনি আত্মিক দান করবেন। অর্থাৎ দেহের যে কোন অংশ তিনি প্রার্থীকে দান করতে প্রস্তুত। তিনি আরও ঘোষণা করলেন যদি কোন প্রার্থী শিবি রাজ্যও চায় তাও দান করে রাজ্য থেকে চলে যাবেন রাজা।

রাজার এরূপ ঘোষণার প্রভাবে দেবরাজ শক্র রাজাকে পরীক্ষা করতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে রাজন, আমি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, দুর্বল ও দরিদ্র। আমি আপনার কাছে এক হাজার সুবর্ণমুদ্রা ভিক্ষার জন্য এসেছি।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা একহাজার সুবর্ণমুদ্রা দিতে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করলেন।

ব্রাহ্মণবেশী দেবরাজ শক্র সুবর্ণমুদ্রা গ্রহণ করে ওখান থেকে চলে যাবার ভান করে আবার ফিরে এসে রাজার নিকট নিবেদন করলেন, 'হে রাজন, আমার ঘর জীর্ণ এবং অরক্ষিত। ওখানে এত সুবর্ণমুদ্রা রাখা ঠিক হবে না। তাই ওগুলো আপনার নিকট গচ্ছিত রাখতে চাই। প্রয়োজন পড়লে যেন ওইগুলো পেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।'

রাজা কোষাধ্যক্ষকে ওইরূপ নির্দেশ দেবার পর খুশি মনে দেবরাজ চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর দেবরাজ শক্র যুবক ব্রাহ্মণের বেশে আবার রাজার

কাছে এলেন। এবার বললেন, 'হে রাজন, আমাকে এ রাজ্য দান করুন।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজা পাত্রমিদ-সভাসদদের সামনে ব্রাহ্মণকে সিংহাসনে বসিয়ে বললেন, 'আমার রাণী সুবর্ণগর্ভা আর রথ ছাড়া আমার রাজ্যের সব কিছুই আপনাকে দান করলাম।'

অন্তঃসত্ত্বা রাণী সুবর্ণগর্ভাকে সঙ্গে নিয়ে রাজা রথে আরোহন করে নগর থেকে বের হলেন।

কিছুক্ষণ পর দেবরাজ শক্র তরুণ ব্রাহ্মণের বেশ পরিত্যাগ করে অন্য এক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণপূর্বক রাজার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, 'হে রাজন, আপনার রথখানা আমাকে দান করুন।'

রাজা অরিন্দম ব্রাহ্মণকে রথখানা দান করে হেঁটেই এগোতে লাগলেন।

খানিক পরে দেবরাজ শক্র ব্রাহ্মণের বেশ পরিত্যাগ করে আবার আগের জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে রাজার কাছে নিবেদন করলেন, 'হে রাজন, অনেকদিন আগে আপনার নিকট যে একহাজার সুবর্ণমুদ্রা রেখেছিলাম, তা এখন আমাকে ফিরিয়ে দিন; ওই মুদ্রা আমার প্রয়োজন পড়েছে।'

রাজা ভীষণ বিপদে পড়লেন। তিনি ভুলবশতঃ ওই একহাজার সুবর্ণমুদ্রা সহ ব্রাহ্মণকে রাজ্যদান করে ফেলেছেন। তাই রাজা বললেন, 'হে ব্রাহ্মণ, এখন আর কিছু করার নেই। এর পরিবর্তে আমি সুবর্ণগর্ভা সহ আপনার দাস হব।'

ছদ্মবেশী দেবরাজ শক্র এতে রাজী হলেন না। তখন রাজা অরিন্দম ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের এক ধনশালী গৃহস্থের কাছে রাজমহিষী সুবর্ণগর্ভাকে পাঁচশ সুবর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বিক্রী করলেন। আর নিজেকে পাঁচশ সুবর্ণমুদ্রার পরিবর্তে বিক্রী করলেন এক সমৃদ্ধশালী ব্রাহ্মণের নিকট।

ছদ্মবেশী দেবরাজ শক্র এক হাজার সুবর্ণমুদ্রা পেয়ে ওখান থেকে

চলে গেলেন।

রাজা অরিন্দমকে দ্বারপালের কাজ দেয়া হলো। তখন থেকে রাজা একাকী নগরদ্বার রক্ষা করত ; ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের নিকটে এক গৃহে বাস করেন।

কৃষ্ণপক্ষের এক গভীর রাতে বৃষ্টি শুরু হলো। এমনি সময় রাণী সুবর্ণগর্ভা এক মৃত পুত্র সন্তান প্রসব করলেন।

মৃত সন্তান দেখে প্রভু গিন্নী সরোষে বললেন, 'ওহে চণ্ডালী, দুষ্ট দাসী, মৃত পুত্রসহ বাড়ি থেকে বের হয়ে যা।'

সুবর্ণগর্ভা বিনয় কণ্ঠে বললেন, 'বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, আবার গভীর রাত, একাকিনী কেমনে ঘরের বাইরে যাব ?'

ক্রোধান্বিত হয়ে প্রভু গিন্নী ধমক দিয়ে বললেন, 'যদি মানে মানে বেরিয়ে না যাস, তবে চুলের মুঠি ধরে বের করে দেব।

উপায়ন্তর না দেখে মৃত পুত্রকে কোলে নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে রাণী সুবর্ণগর্ভা ধনশালী গৃহস্থের বাড়ি থেকে বের হলেন। হাঁটতে-হাঁটতে নগর দ্বারে পৌঁছলেন রাণী। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে-কেঁদে রাণী সুবর্ণগর্ভা সিংহ দরজা খুলে দিতে দ্বারপালকে অনুরোধ করলেন।

দ্বারপাল হলেন রাজা অরিন্দম। অন্ধকার রাতে অঝোরে বৃষ্টির জন্য কেউ কাউকে চিনতে পারছিলেন না।

আকাশবিদারী বিলাপ ধ্বনি করে যখন রাণী কাঁদতে শুরু করলেন, তখন রাজা রাণীকে চিনলেন এবং দ্বার খুলে দিলেন দ্বারপাল বেশী রাজা অরিন্দম। তিনি যে রাজা অরিন্দম তাও রাণীকে জানালেন।

সঙ্গে সঙ্গে রাণী রাজা অরিন্দমের পদতলে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন।

রাণীর সংজ্ঞা ফিরে এলে সমব্যথী রাজা অরিন্দম রাণীকে বললেন, 'অপেক্ষা কর রাণী, আমি এখনি সত্যক্রিয়া করে ছেলের পুনর্জীবন দান করব।'

রাজা ও রাণীর সত্যাধিষ্ঠানের প্রভাবে মৃত শিশু প্রাণ ফিরে

পেলেন। মৃত শিশু যখন চোখ মেলে হেসে উঠল তখন দ্রুতলয়ে রাণী যুবরাজকে কোলে তুলে বারবার চুমো খেতে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে ওখানে এলেন দেবরাজ শক্র। নিজের পরিচয় দিয়ে রাজা ও রাণীকে শুচিনগর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে নিজের রাজ্যে চলে গেলেন।

রাজা অরিন্দম পাত্রমিত্র সহ আবার সুখের রাজত্ব করতে শুরু করলেন। রাজা ও রাণী বাকী জীবন রাজ্য সুখ ভোগ করতে করতে দানাদি পুণ্য কার্যাদি সমাপন করে, মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

তথাগত এ ধর্মদেশনা শেষ করে বললেন, 'ওহে ভিক্ষুগণ কেবল এখন নয়, আগেও পরিপক্ক জ্ঞান অবস্থায় এরূপ মহাদান করতাম।'

তারপর তথাগত বুদ্ধ বললেন, 'তখনকার দেবরাজ শক্র বর্তমানে আর কেহ নহে, আমার শাসনে দিব্যচক্ষু বিশিষ্ট অনুবদ্ধ নামে পরিচিত। রাজা অরিন্দমের মতো হলো দেবী মহামায়া আর পিতা হলো মহারাজ শুদ্ধোদন। ওই রাণী সুবর্ণগর্ভা হলো দেবী যশোধরা আর মৃতপুত্র যাকে জীবিত করেছিলাম ও হলো যুবরাজ রাহুল। দেবমানবের শাস্তা আমি সম্যক সমুদ্ধ অরিন্দম রাজা ছিলাম।'

বুদ্ধদত্ত মহাথের ঘোষণা করলেন এখানেই 'আরেনতামা তারা' ধর্মগ্রন্থ শেষ।

আরও বিভিন্ন মেজবান শেষ করে ভিক্ষুদের এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাইয়ে-দাইয়ে আজকের 'সাতদিন্যা' অনুষ্ঠানটি শেষ করলেন দেওয়ান পরিবারের লোকেরা।

॥ পঁচিশ ॥

গতকাল খবর এসেছে আমি এম. এ. পরীক্ষা পাশ করেছি। খবরটা নিয়ে এসেছেন নরহরিদা। কলকাতায় ওঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন এম. এ. রেজাল্ট বের হলেই যেন খবরটা তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়। বন্ধুর পাঠান টেলিগ্রামটা আমাকে দিলেন উনি।

সংবাদটি পেয়ে আমরা সবাই আনন্দে আত্মহারা। নরহরিদাও খুব খুশি ওঁর চোখে-মুখে পরিতৃপ্তি পরিব্যাপ্ত।

আমার পাশের কৃতিত্বটা সবচেয়ে বেশী নরহরিদার। উনি তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে নোটস্ আনিয়েছেন। সাজেশনস্ যোগাড় করে দিয়েছেন। ওগুলো গলাধঃকরণ করে আমি তো পরীক্ষার খাতায় বমি করেছি। বাস, তিন বছরের মাথায় শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে, এম. এ.। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। মনে মনে ভাবি আমি এখন একজন কেউকেটা। আমাকে নাগাল পায় কে। সমাজের একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আমি।

সফলতার খবরটা পেয়ে নরহরিদাকে গড় হয়ে প্রণাম করলাম। ওঁকে বললাম, 'নরহরিদা, আপনার দান জীবনে ভুলব না। আপনার জন্যই বি. এ. এবং এম. এ. দুটো ডিগ্রীই পেয়েছি।'

নরহরিদাকে চা মিষ্টি খাইয়ে দিলাম। তিনি বললেন, 'চা মিষ্টি খাওয়ালে চলবে না। ভাল করে মাংস খাওয়াও। পোলাউ, কোরমা, কালিয়া, বিরিয়ানীর ব্যবস্থা করো।'

বিনম্র কণ্ঠে বললাম, 'আমার দেহের মাংস কেটে খাওয়ালেও আপনার ঋণ পরিশোধ হবে না। বিলাশ খাবারের কথা তো বলছেন। অবশ্যই খাওয়াব।

একথা ওকথা বলে নরহরিদা চলে গেলেন।

আমার এম. এ. পাশের খবরটা তড়িৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়লো। স্কুলের সবাই খবর শোনে খুশি। ছামনু বাজারের মাঝ দিয়েই আমাকে স্কুলে যাওয়া-আসা করতে হয়। বাজারের দোকানদারেরাও আমার এ কৃতিত্বের জন্য খুব আনন্দিত।

আজ বড় দুঃখ হয় আমার এ চমৎকার সংবাদটি স্কুলের সেক্রেটারী ভগবান দেওয়ান মশায় জানতে পারলেন না। তিনি চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে। উনি থাকলে খুব সন্তুষ্ট হতেন। আনন্দে গদগদ হয়ে যেতেন তিনি।

আমার শিক্ষকতার জীবনের অনেক বছর কেটে গেছে। অনেক পাশও করলাম। কিন্তু নিজের পারিবারিক জীবনে কিছুই তো করলাম না। বিয়ের সময় তো চলে গেছে অনেক আগে। প্রৌঢ়ত্বের দরজা তো ছুঁইছুঁই। এখন এদিকটার কথা ভাবতে হবে। আর দেরী করাটা ঠিক হবে না।

তাই গোমতীকে বিয়ে করাটাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। ও আমার দিকে চেয়েই বোধ হয় বসে আছে। তা না হলে ওর মা বাবা, পাড়া-পড়শী সবাই তার বিয়ে দেবার জন্য এত চেষ্টা করলো, কিন্তু সব সময় ও বলে এসেছে মাস্টারবাবুর বিয়ে হয়ে গেলেই আমার স্ত্রীর কাছে আমাকে সঁপে দিয়েই নাকি শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে। কিন্তু ওর অবচেতন মনে আমার জন্য একটু আকর্ষণ আছে বৈকি! যদিও এই আকর্ষণের কোন কিছু এত বছরেও টের পাইনি।

আমাদের মধ্যে বাহ্যিক একটা আকর্ষণ বিদ্যমান। দুজনের মাঝে কেউ রাগ করলে, কি করে একে অন্যের রাগ ভাঙাতে হয়, তা আমরা জানি। কে, কখন, কোন্ কারণে খুশি হলো, তা আমরা মুখ দেখেই বুঝতে পারি। কে দুঃখ পেল, কিভাবে একে অপরকে সান্ত্বনা দিতে হয়, তাও আমরা জানি।'

কিন্তু যে আকর্ষণ বা উন্মাদনা যুবক-যুবতীদের মধ্যে থাকা উচিত

বা থাকেও, ওটা কিন্তু কোনদিন আমরা কেউই টের পাইনি। পদস্খলন তো দূরের কথা। ওটা হবার কোন উপক্রম অথবা স্পৃহা কারও ছিল না।

অবিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন, সুযোগ পেয়েও দেহ উপভোগের প্রতি নির্লিপ্ত, ওটা যেন ভীষণ ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের সুস্বাদু মাংসের প্রতি অনীহা।

একটা ব্যাপার আমার কাছে বারবারই অকল্পনীয় মনে হচ্ছে তা হলো আমাদের দুই জোয়ান-জোয়ানীর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক আছে বলে, অত্র অঞ্চলের কেউ কোনদিন কোন কুৎসা রটায়নি, যা মানুষের সহজাত ব্যাধি।

ভাবতে বড় অবাক লাগে, এ অঞ্চলের লোকেরা আমায় খুব ভালবাসে বলে বোধ হয় এ কলঙ্ক থেকে রেহাই পেয়েছি অথবা আমি বোধহয় অজাতশত্রু।

বেশ কিছুদিন ভীষণভাবে ভেবে ভেবে এক শুভদিনে-শুভক্ষণে সবাইকে জানিয়ে দিলাম আমি গোমতীকে বিয়ে করব। ওদের আরও বলে দিলাম, খুব শীগগিরই দিন স্থির করছি।

এ খবর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো। প্রবাদ আছে, কুকথা বাতাসের আগে নাকি ছুটে। অনেকের কাছে এটা কুকথা। কারণ এক উচ্চবর্ণীয় উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণের সঙ্গে এ অশিক্ষিত গণ্ডগ্রামের চাকমা মেয়ের বিয়ে। এটা কুকথা ছাড়া আর কি। খবর চলে গেছে দূরে বহু দূরে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ভারত থেকে বাংলাদেশে। খবরটা আগরতলায় যারা আমাকে চেনেন ওরাও জেনে গেছে॥

কয়েকদিন পর কাকাবাবুর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। চাকমা মেয়ের সঙ্গে বিয়ের খবর শোনে তিনি অতীব দুঃখিত ও মর্মাহত। তিনি এরূপ আশা করেননি। আমি নাকি আমাদের বংশের কুলাঙ্গার। কাকাবাবুর কড়া নির্দেশ, ওঁর মৃত্যুতে আমি যেন এগার দিনের অশৌচ পালন না করি।

কিছুদিন পর সুচিত্রার একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে, ও নাকি আগেই জানতো আমার ও গোমতীর মধ্যে অবৈধ মিলন বহু আগে থেকেই ছিল তা জেনেই ও আমাকে বিয়ে করেনি।

ইতিমধ্যে আমি একবার ছৈলেংটা গিয়েছিলাম। আমার উপকারী-হিতাকাঙ্খী-দুর্দিনের বন্ধু নরহরিদাকে 'গোমতীকে বিয়ে করছি' বলে জানালাম। শোনে তিনি আঁতকে উঠলেন। সরোষে বললেন, 'বিমল, তুমি কি ক্ষেপেছ! তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে! এত শিক্ষিত হয়েও তুমি একজন চাকরাণী তাও আবার এক চাকমা মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছো।' একটু থেমে তিনি অরুচিকর গলায় বলেন, 'আমাদের দেশের রথী, মহারথীরা অর্থাৎ বড় বড় জনদরদী নেতারা বিরাট বিরাট সভায় বক্তৃতা করে বলেন, 'এ নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত আদিবাসীরা আমাদের ভাই ওরা আমাদের বন্ধু। তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমাদের চলতে হবে। ওদের সঙ্গে করতে হবে আত্মীয়তা।'

হঠাৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমায় প্রশ্ন করেন নরহরিদা, 'কয়জন জনদরদী নেতা ওঁদের ছেলেদের সঙ্গে কোন উপজাতি মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন? ওই পরিসংখ্যান কি আমায় দিতে পার বিমল?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উনি সহজ গলায় বলেন, 'ওহে বাপু যক্ষ্মা রোগীর জন্য চাঁদা তোলা যত সহজ, কিন্তু যক্ষ্মা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করা তত সহজ নয়।'

বড় বড় বক্তৃতা করে নরহরিদা নৈব্যক্তিক গলায় বলেন, 'না-না বিমল, আমি তোমার এ বিয়েতে সায় দিতে পারলাম না।'

আমি মাথা নত করে ছৈলেংটা থেকে চলে আসি।

যখন কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন ভাবলাম, এখন ফিরে আসাটা আর ঠিক হবে না। তাই ঠিক করলাম এবার গোমতীকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত। ও যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, যত হীনমন্যতায় থাকুক না কেন, তারতো একটা মতামত আছে।

একদিন বিকেলবেলায় গোমতী বাড়ি থেকে ডেরায় ফিরে এসেছে। শেষ করে নিয়েছে ও বিকেলের কাজকর্ম। এ সময় সাধারণতঃ আমি বেড়াতে যাই। আজ আর বেড়াতে বের হলাম না।

পড়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে আছি। গোমতীকে ডেকে বললাম, 'গোমতী তোর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ জরুরী কথা আছে।'

দ্রুতলয়ে গোমতী বললো, 'শীগগির বলুন। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

বললাম, 'কাজ পরে হবে। এ মোড়াটাতে বোস।'

গোমতীর সঙ্গে আমার দৃষ্টির সংঘর্ষ হতেই ও শিউরে উঠল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গোমতী মোড়াটাতে বসলো।

ওকে বললাম, 'গোমতী, তুই আমার দিকে দেখতো ভাল করে।'

উৎকণ্ঠা নিয়ে গোমতী আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কেন, কি হয়েছে?' ওর চোখে-মুখে ভীতি, ব্যাকুল দৃষ্টি।

ধমকের সুরে বললাম, 'আমার দিকে তাকা বলছি।'

ভ্যাবাচ্যকা খেয়ে গোমতী আমার দিকে তাকালো।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে তোর পছন্দ হয়।'

শুকনো মুখে গোমতী আমায় বলে, 'আজ হঠাৎ এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন মাস্টারবাবু?'

স্নেনভরা কণ্ঠে ওকে বললাম, 'আমি তোকে বিয়ে করতে চাই। এ সম্পর্কে তোর কিছু অমত আছে?'

গোমতী লজ্জায়, কুণ্ঠায় মাথা নিচু করে ফেললো। তারপর কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে হলো ও অতীতের দিকে চেয়ে-চেয়ে নানারকম ঘটনার মিছিল দেখছে।

উত্তেজিত কণ্ঠে ওকে বললাম, 'মাথা নত করে থাকলে চলবে না। আমি সাফ-সুফ উত্তর চাই।'

গোমতী নিরুপায় হয়ে মাথা উঠাল। বিভ্রান্ত চোখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। ওর দৃষ্টি ভাবলেশহীন। দৃষ্টিতে প্রতিবাদ নেই, সমর্থনও নেই। চোখ দুটো অশ্রুভারে টলমল। ওগুলো চিক্‌চিক্‌ করছে। এখনি শ্রাবণের ধারার মতন বর্ষণ শুরু হয়ে যাবে বোধ হয়।

পরম হিতৈষীর গলায় গোমতীকে বললাম, 'আমার মা আমাকে খুব ভালবাসতেন। মা মারা যাবার পর তোর মতো আমাকে আর কেউ ভালবাসেনি। তোরা খুব গরীব। তোর বাবা বুড়ো হয়ে গেছে। ও মরে গেলে তোব ভারতো আমাকেই নিতে হবে।'

দুঃখে-সুখে কেমন এক বিচিত্র মুখ করে হাসলো গোমতী। কিন্তু কোন শব্দ হলো না। তারপর উদাস গলায় ও বললো, 'দয়ার কথা বলছেন মাস্টারবাবু।'

অসহায় কণ্ঠে বললাম, 'ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, দয়া নয়।'

খিলখিল করে হেসে উঠে গোমতী। বিদ্রূপ গলায় বলে, 'তাহলে আমা' দেহ চান্। আপনি আমার মনিব। শুনেছি শহরে অনেক মনিব তো দেহ না দিলে মাসের পুরো বেতনই দেন না।

বিপন্ন মুখে বললাম, 'তুই কি বলছিস। তুই কি পাগল হয়ে গেছিস।'

দপ করে জ্বলে উঠে গোমতী বললো, 'না মাস্টারবাবু, আমি পাগল হইনি, ঠিকই বলছি। আমরা গরীব বলে, আপনি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন।'

গম্ভীর গলায় বললাম, 'না—না, তামাশা নয়, আমি ঠিকই বলছি। ভগবানের নামে এই পৈতা ছুঁয়ে শপথ করে বলছি আমি তোকে বিয়ে করব। চিরদিনের মতো জীবন সঙ্গিনী করতে চাই তোকে।'

পৈতা ছুয়ে আমার প্রতিজ্ঞা করার কথা শুনে ওর চোখে মুখে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। সম্বিৎ ফিরে পেল ও। তারপর কাতরকণ্ঠে বলে, 'আমার জন্য আপনি নিজেকে এতো ছোট করবেন

কেন? আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আপনাকে পরিত্যাগ করবেন। আপনি জাতিচ্যুত-সমাজচ্যুত হবেন।'

রাগতস্বরে বলে উঠলাম, 'ওটা আমি দেখব। এটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। তুই আমাকে বিয়ে করলে তোকে তো আর সমাজচ্যুত হতে হবে না।'

ভাঙা ভাঙা স্বরে গোমতী বললে, 'তা আমি জানি না। ওসব জানেন গাঁয়ের সমাজপতিরা।'

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'ওই ভার আমার। আগে তো তোর কি ইচ্ছে তা জেনে নিই।'

গোমতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ নির্বাক, ঘাড় বেঁকিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকে। খানিক পরে বলে, 'মাস্টারবাবু, আপনি আরও চিন্তা করুণ। বিয়ে ছেলে খেলা নয়. নিজের জীবন নিয়ে ছিমিমিনি খেলবেন না।'

পুরনো দিনের সারিসারি ঘটনার মিছিল ভিড় করে আসছে মনে। তাই গোমতীকে পাবার জন্যে অদম্য আগ্রহে উন্নত হয়ে উঠলাম। বিবক্তি কণ্ঠে বললাম, 'আমি অনেক ভেবেছি. আমার আর ভাববার কিছু নেই।' একথা বলে ওর চিবুকটা ধরে জিজ্ঞেস করলাম. 'ওরে দস্যু মেয়ে, তোর মত কি? শীগগির বল, আমার আর তর সইছে না।'

আমার হাতটা সরিয়ে গোমতী আমাকে একটা মোলায়েম ধাক্কা দিল। তারপর হালকা গলায় মুচকি হেসে বললো, 'আপনি ভারী অসভ্য।' এই কথা বলে এক দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে পালিয়ে গেল গোমতী। যাবার সময় হেসে হেসে পিছন দিকে চাইলো একবার।

দেখলাম লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠেছে গোমতীর সারা মুখ। ওর সারা শরীরে সলজ্জ পুলকের শিহরণ খেলে যাচ্ছে যেন।

আমি জোর গলায় বলে উঠি, 'তাহলে বুঝলাম, তোর কোন অমত

নেই। যাই তোর বাপ-মায়ের কাছে, তাদের মতামতটাও জেনে আসি।'

রান্নাঘর থেকে গোমতী টেনে টেনে রসাল সুরে বললো, 'যান, দেখবেন বর্শা দিয়ে যেন হাঁকড়ে না দেয়'।

শোনা গেল গোমতী হেসে কুটিকুটি খাচ্ছে।

অনাবিল খুশির আবেগে বললাম, 'আচ্ছা দেখি, তোকে বর্শা দিয়ে হাঁকড়ায় না আমাকে হাঁকড়ায়।'

আমার মন তখন আনন্দে ফেঁপে ফুলে উঠছে, রঙিন ফানুসের মতন যেন হাওয়ায় দুলছে।

পরদিন গোমতীর মা-বাবার সম্মতির কথা জানতে গেলাম। শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেছে ওরা। তবুও ওরা বলেছে, 'মাস্টারবাবু, আমরা গরীব চাকমা। আর আপনি শিক্ষিত ব্রাহ্মণ। আপনি এ ব্যাপারে আরও ভাবুন।'

ধমক দিয়ে বললাম, 'আমার সম্পর্কে তোমাদের ভাবতে হবে না। ভেবে চিন্তেই আমি অগ্রসর হয়েছি।'

গোমতীর মা-বাবা আর কোন কথা বলে না। লজ্জায়, আনন্দে মাথা নিচু করলো।

হাওয়ার মধ্যে যেন নতুন বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। কিন্তু একটা বড় ভাবনায় পড়লাম। কোন্ ধর্ম মতে বিয়ে হবে। আমাদের সমাজের বিধান অনুযায়ী, না ওদের সামাজিক নিয়ম অনুসারে। আমাদের কোন পুরোহিত আমার বিয়েতে মন্ত্র পাঠ করাতে আসবেন না। বলবে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা শুনলে ওকে এক ঘরে করবে। আবার গোমতীদের সমাজের বৌদ্ধ ভিক্ষু অথবা চাকমা অজা কি বলবেন তা ওঁরাই জানেন।

ভেবে ভেবে ঠিক করলাম, আমরা দুজন সাবালক, তাই ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিসে গিয়ে বিয়ে রেজেষ্ট্রি করে নেওয়াই সমীচীন হবে। তাতে ভবিষ্যতে কেউ কাউকে ছাড়তে পারবে না। গোমতী তো

আমাকে ছাড়বেই না আর আমি যদি ওকে পরিত্যাগ করি তবে তাকে মাসে-মাসে খোরপোশ দিতে বাধ্য থাকব। 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম।' অতএব আমারও তো মতের গরমিল হতে পারে। তবুও এ অবলা —সরলা চাকমা মেয়েটার যেন কোন অসুবিধা না হয়।

সাধু প্রস্তাব। বিয়ে রেজেষ্ট্রি করাই ঠিক করলাম।

আরও ঠিক করলাম আগরতলার ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের অফিস থেকে ফিরে এসে দুজনে চলে যাব লংতরাই পাহাড়ের উপরে। ওখানে বাবা শঙ্করের পূজো দিয়ে আশিস্ নিয়ে আসব। পরদিন ছামনু বিহারেও পূজো দিয়ে তথাগত বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রার্থনা করব।

এভাবে বিয়ের ব্যাপারটা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। মনে মনে বিয়ের একটা দিনও স্থির করে ফেললাম।

গাঁয়ের মধ্যে হঠাৎ একটা কানাঘুষা চললো। ওরা বলছে আমাদের বিয়ে সম্পর্কে সমাজপতিরা নাকি সম্মতি দেবেন না। চাকমা মেয়ের সঙ্গে বাঙালী ছেলের বিয়ে হতে পারে না। চাকমারা নাকি শাকাক্ষত্রিয় বংশের। তাই তাদের সঙ্গে নাকি অন্য কোন জাতি বা উপজাতির বিয়ে হতে পারে না। অতএব গাঁয়ের সমাজপতিরা এ বিয়েতে বাধার সৃষ্টি করবেন।

খবরটা আমার কানেও এলো। কথাটা শুনে আমি একটু ভড়কে গেলাম। বুক দুরদুর করতে লাগলো। ভাবি ব্যাপার কি! অনেক উপজাতি মেয়ের সঙ্গে বাঙালীর বিয়ে হয়েছে। আগরতলাতে এরকম ভুরিভুরি ঘটনা আছে। তাই মনে মনে খুঁজছি ত্রিপুরায় কোন চাকমা মেয়ের সঙ্গে বাঙালী ছেলের বিয়ে হয়েছে কি না? খুঁজতে শুরু করেছি। অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলাম। না ওরাও তাৎক্ষণিক কোন বিয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করতে পারলো না।

একটা মহাভাবনায় পড়লাম। তবু কথা আছে নাচতে যখন নেমেছি, ঘুঙুরও বাঁধতে হবে, ঘোমটাও খুলতে হবে। তাই একদিন কাকভোরে হেডমাস্টারবাবুর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম। জানালাম

ওঁকে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা।

শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন হেডমাস্টারবাবু। বহুক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন আমার মুখমণ্ডলে এতটুকু পরিবর্তন নেই। আমি যে গোমতীকে বিয়ে করতে কৃতসঙ্কল্প তা তিনি আমার মুখ দেখে বুঝলেন। আরও জানলেন এ ব্যাপারে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। কিন্তু আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হেডমাস্টারমশায়ও চুপটি মেরে থাকেন। বললেন না কিছু।

হেডমাস্টারমশায়কে চুপ করে থাকতে দেখে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম। বুঝলাম গ্রামের মধ্যে যে কানাঘুষা চলছে তার মধ্যে সত্যতা আছে।

সমস্ত শরীর জুড়ে একটা অস্থির আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে আমার। চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছে যেন।

নীরবতা ঘুচিয়ে দেবার জন্য হঠাৎ হেডমাস্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার, আপনি দেখি কিছুই বলছেন না?'

ধীরে ধীরে বিমর্ষ বদনে বললেন হেডমাস্টারবাবু, 'কি বলবো, কিছুই তো ঠিক করতে পারছি না।'

'কেন, কি হয়েছে? এ বিয়ে কি হতে পারে না?'

'বোধ হয়, পারে না।'

'কেন, বলুন তো?'

'এ বিয়েতে সমাজপতিদের সম্মতি পাওয়া যাবে না। আমার বাপ-ঠাকুরদা সমাজপতি ছিলেন। আমরা কারবারি বংশের। ওঁরা এ বিয়েতে সায় দিতেন না।'

'তাহলে কি করা যায়?'

'আমি সমাজপতিদের নিয়ে একটি সালিসী বসাব। দেখি ওঁরা কি বলেন!'

'আমি যদি গোমতীকে নিয়ে গিয়ে আগরতলায় ওকে বিয়ে করি তাহলে সমাজপতিরা কি করবেন?'

'তাহলে ওঁরা গোমতীর মা বাবাকে এক ঘরে করবেন।'

'আমি যদি ওর মা-বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই, তাহলে সমাজ-পতিরা কি করবেন?'

'আপনি তাদের নিয়ে যেতে পারবেন না। সমাজপতিদের নির্দেশে, এই অঞ্চলের সব চাকমারা বাধা দেবে।

'যদি রাতের অন্ধকারে তাদের সবাইকে নিয়ে পালিয়ে যাই।'

'তা ও পারবেন না। চাকমারা যদিও শান্তিপ্রিয়, কিন্তু সমাজ-পতিদের নির্দেশ পেলে ওই সময় ওরা হয়ে উঠবে হিংস্র-দুর্ধর্ষ। তখন দাঁড়াবে চাকমা সমাজের ইজ্জতের প্রশ্ন।'

'তাহলে আমাকে কি করতে বলেন?'

'সালিসীতে সমাজপতিরা কি বলেন আগে দেখি, তারপর ভবিষ্যৎ কর্মপ্রন্থা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করব।'

হেডমাস্টারবাবুর কথায় মুষড়িয়ে পড়লাম। গোমতীকে বিয়ে করার উৎফুল্লতা আমার চুপসে গেল।

বিভিন্ন গাঁয়ের সমাজপতিরা সালিসীতে বসেছেন। এসেছেন বিশ্বেশ্বর খিসা, বিঘ্নবিনাশন কারবারি, ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেওয়ান, অমরেন্দ্র দেওয়ান এবং আরও অনেকে। হেডমাস্টার রবীন্দ্র নারায়ন কারবারি ও সালিসীতে আছেন।

ওরা সবাই আমার সঙ্গে গোমতীর বিয়ের সম্পর্কে বিভিন্নভাবে বিচার-বিবেচনা করলেন। অনেক বাকবিতণ্ডা হলো। কেউ চাকমা উপজাতির ঐতিহ্যের পাড়লেন। আমার পক্ষ নিয়ে হেডমাস্টারবাবু অনেক কাঠখড়ি পোড়ালেন।

বিশ্বেশ্বর খিসা হলেন একজন ডাকসাইটে সমাজপতি। উনি চাকমা উপজাতির স্বপক্ষে বলতে গিয়ে ওঁদের পুরনো ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরলেন। তিনি বললেন, 'আমরা শাক্যবংশ সম্ভূত তথাগত বুদ্ধের বংশধর। আগে আমরা পৈতাধারী ক্ষত্রিয় ছিলাম।'

তিনি চাকমানামের উৎস সম্পর্কে বলেন, 'মগ ভাষায় 'শাক্য' অর্থ সাক আর 'মাং' অর্থ হলো রাজা। অতএব যারা রাজবংশ সম্ভূত তাদের বলা হয় 'সাকমাং'। এ সাকমাং শব্দ থেকে 'চাকমা' শব্দটি এসেছে। এ জন্য প্রমাণ করতে চাই আমরা শাক্য বংশ সম্ভূত ভগবান বুদ্ধের বংশধর।'

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্যের একটি কাহিনী বলছি যা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে আমরা রাজার বংশধর।

জলদ গম্ভীর কণ্ঠে বিশ্বেশ্বর খিসা বলতে থাকেন, 'চম্পক নগরের প্রধান রাজা উদয় গিরির পুত্র বিজয় গিরি দিগ্বিজয়ে বের হবার ইচ্ছে করলেন। তিনি ওই রাজ্যের এক সামন্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের ছেলে রাধামোহনকে সেনাপতি পদে বরণ করলেন। তিনি যাবেন আরাকান অভিযানে। রাজা বিজয়গিরি কথা দিয়েছেন বিজিত রাজ্যের অর্ধেক অংশ দেবেন সেনাপতি রাধামোহনকে।

বিপুল সৈন্য নিয়ে সেনাপতিসহ রাজা বিজয়গিরি আরাকানের কাছে কালাবাঘা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করলেন। রাজা সেনাপতি রাধামোহনকে আদেশ দিলেন, 'সামনের দিকে অগ্রসর হও।'

সৈন্যসহ সেনাপতি রাধামোহন উপস্থিত হলেন সমুদ্র পারে। আরাকানের মগরাজার কাছে দূত পাঠালেন সেনাপতি। আরাকানের মগরাজ দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। ফলে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আরাকানের সৈন্যরা সেনাপতি রাধামোহনের শৌর্যের কাছে বেশীক্ষণ টিকতে পারেনি। ওদের ছিন্নভিন্ন করে দিলেন রাধামোহন। মগরাজার সৈন্যেরা পিছু হটতে হলো। অমিত বিক্রমে সৈন্যসহ সেনাপতি রাধামোহন আরাকানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মগরাজাকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করলেন। উপায়ান্তর না দেখে আরাকান রাজ রাজা বিজয়গিরির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রাজা বিজয়গিরি মগরাজকে বধ না করে ক্ষমা

করে দিলেন।

তারপর সেনাপতি রাধামোহন এক-এক করে উচ্চ ব্রহ্ম, কাঞ্চনপুর এবং কালঞ্জর বা কুকি রাজ্য জয় করেছিলেন।

এভাবে যুদ্ধ করতে-করতে বারো বছর কেটে গেল।

একদিন রাধামোহনের মনে পড়ে ওর স্ত্রীর কথা। বাড়িয় চিন্তায় সেনাপতির মোহ ভেঙ্গে যায়। ঘরে ফেরার জন্য সেনাপতির মন উদগ্র হয়ে উঠে।

সঙ্গে সঙ্গে রাধামোহন রাজা বিজয়গিরির কাছে বাড়ি ফিরে যাবার নির্দেশ চাইলেন। সেনাপতির ইচ্ছা পুরণে রাজী হলেন রাজা।

মনের আনন্দে দেশে ফিরলেন সেনাপতি রাধামোহন। ধনপতি স্বামীকে পেয়ে খুশি। ধনপতির গর্ভজাত সন্তান সারাধনের বয়েস তখন বারো বছর। ছেলেকে পেয়ে রাধামোহন আনন্দে আত্মহারা।

ওদিকে রাজা বিজয়গিরি দেশে ফেরার জন্য চললেন। ফেরার পথে খবর পেলেন ওঁর পিতা উদয়গিরির মৃত্যু হয়েছে। তাই কনিষ্ঠ পুত্র সমরগিরি এখন ওই রাজ্যের রাজা। তিনি মনে মনে ভাবেন ছোট ভাইকে কি করে শ্রদ্ধা জানাবেন। তাই তিনি আর দেশে ফিরলেন না।

রাজা বিজয়গিরি সৈন্যসহ আবার আরাকানে ফিরে সুখে ওখানেই রাজত্ব করতে থাকেন।

সেনাপতি রাধামোহন চম্পক নগরে ফিরে রাজা সমর গিরির কাছে বিজিত রাজ্যের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

চুঙা কাদিন্যাই পানি খ্যেই,
ছিতুগা মান্‌জ্যত্তুন পৈদা নেই।

[ওখানকার লোকেরা চুঙায় জল খায়, তাদের কাছে কোন পৈতা নেই]

রাধামোহন আরও বলেন,

দুধে খাদি ছিজেদং,

পৈতা বারাৎ গরিন্যাই ছিহ্ন বেরেদং।

[আমরা ওখানে দুধ পান করতাম, পৈতা কাঁধে নিয়ে বেড়াতাম।]

কাহিনী শেষ করে বিশ্বেশ্বর খিসা বলেন, 'অতএব রাজা উদয়গিরি চম্পক নগরে বাস করতেন। এ চম্পক নগর থেকে আমাদের চাকমা উপজাতির নামকরণ করা হয়েছে। ওই চম্পক নগরের উদয়গিরি আর হরিশচন্দ্র ছিলেন চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। চাকমারা হলো তাঁদেরই গোষ্ঠী। অতএব আমরা হলাম শাক্য ক্ষত্রিয়ের বংশধর।

সবশেষে বিশ্বেশ্বরবাবু বললেন, 'এ বিয়ের অনুমতি দিতে আমরা অক্ষম। অন্য কোন জাতি বা অন্য কোন উপজাতির সঙ্গে আমরা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারি না।'

এবার অমরেন্দ্র দেওয়ান বলেন, 'আমরা স্বীকার করি এই অঞ্চলের সবাই বিমল মাস্টারের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ এবং ঋণী, ওঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই অঞ্চলের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়াতে এত দ্রুত এগিয়ে গেছে। তাই আমরা সকলে ওঁর কাছে এই সম্পর্কে ক্ষমা প্রার্থী। আমরা অপারগ। আমরা এ ব্যাপারে কিছু করতে পারলাম না বলে অতীব দুঃখিত।'

খানিকবাদে সমাজপতিরা উঠে পড়লেন। আমাকে নিয়ে যে হাট বসেছিল তা ধীরে ধীরে ভেঙে গেল।

॥ ছাব্বিশ ॥

চাকমা সমাজপতিরা সাফসুফ জানিয়ে দিয়েছেন, এ বিয়েতে সম্মতি দিতে ওঁরা অপারগ।

আচমকা একটা ধাক্কা খেলাম।

স্বজাতির কাছ থেকে বাধা। আত্মীয়-স্বজন থেকে বাধা। বন্ধু-বান্ধব থেকে বাধা। এখন আবার চাকমা সমাজপতিদের কাছ থেকেও বাধা।

চারদিকেই শুধু মুশকিল। কিন্তু আসান কোথায় পাই।

গোমতীর কথা ভেবে দেখলাম। ওর দিক দিয়েও হঠাৎ করে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। এখন যদি ফিরে যাই তাহলে গোমতী ভীষণ দুঃখ পাবে। একটা কিছু অঘটন ও ঘটিয়ে ফেলতে পারে, সভ্য সমাজে যা হামেশাই ঘটছে। অশিক্ষিত সমাজে যে ঘটছে না তা নয়, ওখানেও এ বীজ ঢুকেছে। তাহলে উপায়?

সারিসারি করে পুরনো দিনের ঘটনাপঞ্জী মিছিল করে মনের মধ্যে ভাসতে লাগলো। এলোমেলো সব চিন্তা। সব কিছু মাথার মধ্যে কিলবিল করছে। সব বিকল হয়ে গেছে, বিস্বাদ হয়ে পড়েছে।

বিধিবাম। নিয়তি বোধ হয় হেসেছিল যখন আমি আর গোমতী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হবার সঙ্কল্প করি।

এ ব্যাপারে হেডমাস্টারবাবুর সঙ্গে গভীরভাবে আলাপ-আলোচনা করলাম। প্রথমদিকে তিনি কোন পথ বাতলাতে পারেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি সানন্দে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, পেয়েছি। একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি।'

সোল্লাসে বললাম, 'কি উপায় হেডমাস্টারবাবু?'

তিনি বললেন, 'একটা উপায় আছে। আপনি গোমতীকে বিয়ে

করে ওকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছিলেন। তাই না ?

বললাম, 'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

হেডমাস্টারবাবু চশমাটা খুলে ফেললেন। তারপর আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলে উঠেন, 'এক কাজ করুন। ওকে প্রতিষ্ঠিত এক চাকমা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিন। তাহলে দুকূলই রক্ষা হবে।'

আমি আলোর একটা ক্ষীণ রেখা দেখতে পেলাম। কিন্তু কোথায় একজন উপযুক্ত চাকমা ছেলে পাওয়া যাবে ?

নিরুপায় হয়ে আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'এমন ছেলে কোথায় পাওয়া যাবে হেডমাস্টারবাবু ?'

হেডমাস্টারবাবু সহজ গলায় বলেন, 'খুজুন—দেখুন। আমিও তল্লাস করি।'

অনেক ভেবে চিন্তে উভয়ে ঠিক করলাম এটাই হবে উত্তম পথ।

বহু খোঁজাখুঁজির পর কাছাকাছি একজন চাকমা পাত্র পাওয়া গেল যিনি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তিনি এম. বি. বি. কলেজের অধ্যাপক। বেতনও ভাল। নিষ্কণ্টক পরিবার। মা আর ছেলে। নিজের বাড়ি আছে। কিন্তু বর্তমানে মাকে নিয়ে আগরতলায় থাকেন।

ভদ্রলোক এখন বিয়ে করবেন না। কিন্তু করতে পারেন এক শর্তে যদি ওঁর মায়ের চিকিৎসা করতে কেউ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। নতুবা মায়ের মৃত্যুর আগে তিনি কিছুতেই বিয়ে করবেন না। এটাকে কেউ যদি ছেলে পণ হিসেবে ধরতে চান তাহলে অধ্যাপক মশায় মনে খুব দুঃখ পাবেন।

ভদ্রলোকের বাড়ি ময়নামা।

আলাপে জানা গেল অধ্যাপক মশায় গোমতীকে দেখেছেন ছামনু বিহারে গত বৈশাখী পূর্ণিমায়। গোমতী ওই দিন শাড়ী পরে বিহারে

গিয়েছিল। ঐ উৎসবে অধ্যাপক শৈলেন্দ্র কুমার চাকমা মশায়ও এসেছিলেন। নতুন বেশে অনিন্দ্য সুন্দরী গোমতীকে অপরূপা লাগছিল। ওকে দেখে ঔৎসুক্য হয়েছিলেন অধ্যাপক মশায়। মেয়েটির রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চোখ ফেরাতে পারেননি তিনি। খোঁজও নিয়েছিলেন গোমতী সম্পর্কে। বিমল মাস্টারের সঙ্গে মেয়েটির যে কোন অবৈধ সম্পর্ক নেই এ সম্পর্কে অধ্যাপকমশায় নিশ্চিত।

অধ্যাপক মশায়ের মার হৃদস্পন্দনের হার কম, অর্থাৎ হার্টরেট স্বাভাবিক নয়। ডাক্তারের ভাষায় যার নাম 'মাইল্ড হার্ট ব্লক।' অতএব যে কোন মুহূর্তে অধ্যাপকের মা হার্ট ব্লক হয়ে মারা যেতে পারেন। তাই ডাক্তারের নির্দেশ হলো হৃদযন্ত্র চালু রাখতে 'পেস মেকারের' প্রয়োজন। তা করতে হলে কলকাতা গিয়ে তা লাগিয়ে আনতে হবে। যার জন্য দরকার অন্ততঃ দশ থেকে বারো হাজার টাকা।

অধ্যাপক মশায়ের কাছে এতো টাকা নেই। মার চিকিৎসা সত্বর করা দরকার। তাই এ টাকা কেউ যদি দেন তবে তিনি এখনি বিয়ে করতে রাজী।

আনুষ্ঠানিক ভাবে অধ্যাপক শৈলেন্দ্র কুমার চাকমার কাছে গোমতীর সঙ্গে ওর বিয়ের প্রস্তাব করায় তিনি সহজেই রাজী হয়ে গেলেন। তিনি গোমতী সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তদুপরি ছামনু বিহারে প্রথম দর্শনেই গোমতীর প্রেমে পড়ে গেছেন অধ্যাপক মশায়। তিনি দুঃখ করে বললেন, 'এ নিঃস্ব মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে এতো টাকা নেই যে মার চিকিৎসা করাতে পারি। এছাড়া বাবা মরবার সময় যে জায়গা জমি রেখে গিয়েছিলেন তা আমার পড়াশোনায় সবই বিক্রী করতে হয়েছে।'

উচ্চশিক্ষিত—প্রতিষ্ঠিত চাকমা ছেলের সঙ্গে গোমতীর বিয়ের কথা

মোটামুটি পাকা হয়ে গেল। কিন্তু বাধ সাধলো বারো হাজার টাকা।

টাকা কোথায় পাই।

আমি দরিদ্র্য দায়ে শিক্ষকতা করছি। বি. এ., এম. এ. পাশ করার জন্য সারাদিন খাটতে হয়েছে। কষ্টার্জিত স্বল্প পরিমিত অবসর সময়ে যে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না, ওরা যেন স্কুলে যায় তার জন্য অভিভাবকদের বুঝিয়ে-শুঝিয়ে রাজী করিয়ে সরস্বতীর সেবা করেছি। কিন্তু সরস্বতীকে ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করে যদি মা লক্ষ্মীর পূজো করতাম তাহলে আজ গোমতীর হবু স্বামীর চাহিদা মেটাতে এতো হিমসিম খেতে হতো না।

গোমতীকে সব কথা খুলে বললাম। ব্যথাতুর চোখ দুটো দিয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গাল বেয়ে বুকে গিয়ে নামছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে গোমতী, 'না-না, আমার জন্যে কিছু করতে হবে না। আমাকে কোন আশ্রমে টাশ্রমে পাঠিয়ে দিন মাস্টারবাবু।'

আমি ওকে ভাল করে বোঝালাম। বললাম, 'গোমতী তোমাকে এ বিয়ে করতেই হবে। তোমাকে একজন শিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেব, এ সম্পর্কে তোমাকে আমি অনেক আগেই কথা দিয়েছিলাম। এ ছাড়া তোমাকে একজন সুপ্রতিষ্ঠিত চাকমা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেই এটা আমার কর্ত্তব্য। তোমার বিয়ে দেয়া আমার সম্মানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। নতুবা তোমাকে-আমাকে নিয়ে লোকে অনেক কেচ্ছা তৈরী করবে।'

খানিকপর লক্ষ্য করলাম গোমতীর দেহ কাঁপছে। ওর দু'চোখ চকচক করতে লাগলো। দেখলাম ও নিজেকে সামলে নেবার ব্যর্থ চেষ্টা। কিন্তু পারছে কই ?

গোমতীর দুচোখ বেয়ে আবার দরদর ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু সবশেষে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম কৃতজ্ঞতার একটা শিখা শীতল মোমের মতন ওর চোখে-মুখে পরিস্ফুট।

শেষ পর্যন্ত গোমতী ওর আশ্চর্য নিষ্পাপ, স্বচ্ছ দুটো সুন্দর চোখ তুলে বললো, 'আচ্ছা।'

যথারীতি চাকরী করে যাচ্ছি। খাচ্ছি-দাচ্ছি আর ভাবছি কি করে টাকার পাহাড়টা যোগাড় করি। একজন স্কুল মাস্টারের কাছে বারো হাজার টাকাতো টাকার পাহাড়ই।

একবার মনে মনে ভাবি কারও ঘাড়িতে ডাকাতি করে কাড়ি কাড়ি টাকাগুলো যোগাড় করি। আবার ভাবি মাস্টারবাবুরা জীবন -ভর কেবল ছেলে ঠেঙিয়েই আসছেন। ওরা ভীষণ ভীরু। ডাকাতি করতে যে হিম্মতের প্রয়োজন তা তাদের কি আছে।

একদিন স্কুলে অফ্ পীরিয়ডে স্থানীয় একটি দৈনিক পত্রিকা নিয়ে আনমনে উল্টাচ্ছি-পাল্টাচ্ছি আর টাকার কথা ভাবছি এমন সময় হঠাৎ তৃতীয় পৃষ্ঠার একটা খবরের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো।

খবরটা এরূপ ঃ—

পাত্র চাই

পাত্রী ত্রিশ, স্কুল ফাইন্যাল পাশ। মাতৃপিতৃহীনা। গানে বিশারদ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত। সুচীশিল্পে ও গৃহকর্মে নিপুনা। ওর একটা চোখ জন্ম থেকে নষ্ট। ঐ জায়গায় একটা পাথরের চোখ বসানো হয়েছে। দূর থেকে দেখলে বোঝা যাবে না। মৃত্যুর আগে মেয়ের পিতা মেয়ের নামে ব্যাঙ্কে পনেরো হাজার টাকা রেখে গেছেন। ঐ টাকা বিয়েতে যৌতুক হিসাবে দেয়া হবে। অকাশ্যপ ব্রাহ্মণ, এম. এ. পাশ, চাকুরী রত পাত্র চাই।

সৌমেন ভট্টাচার্য
হরিগঙ্গা বসাক রোড
আগরতলা।

খবরটা সঙ্গে সঙ্গে হেডমাস্টারমশায়কে দেখালাম। বললেন, 'পড়লাম। এখন এটা আপনার ব্যাপার। আপনি সবদিক ভাবুন।'

কিছু না বলে স্কুল ছুটির পর ডেরাতে ফিরেছি। সারাদিন ধরে বিজ্ঞাপণটির খুঁটিনাটি-ইতিউতি সবদিক ভেবে দেখলাম। ঠিক করলাম এ বিয়ে আমি করব। নতুবা গোমতীর বিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু বাধ সেধেছে মেয়ে আমাকে বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বারো হাজার টাকা দেবে কিনা। টাকাতো মেয়ের নামে ব্যাঙ্কে আছে।

বিকেল বেলায় ছৈলেংটায় নরহরিদার কোয়ার্টারে চলে গেলাম। গোমতীকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে তিনি তো আমার উপর চটে আছেন।

কতকক্ষণ বিশ্রাম করে ধীরেসুস্থে পত্রিকার বিজ্ঞাপণটা দেখিয়ে সব কথা খুলে বললাম নরহরিদার কাছে। সব বুঝিয়ে শুঝিয়ে বলাতে তিনি আমার সিদ্ধান্তে সায় দিলেন।

ঠিক হলো, তিনি কালই আগরতলায় যাবেন। সব খোঁজ খবর নেবেন। যদি গার্জিয়ান আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজী থাকেন, তবে কনে দেখার তারিখ করে আসবেন নরহরিদা। আরও ঠিক হলো, ওই সময়ে সুযোগ বুঝে পাত্র এবং হবু পাত্রীর সঙ্গে একটা নিভৃত আলাপের ব্যবস্থা করবেন নরহরিদা। ওই সময়ে হবু পাত্রীর কাছ থেকে বারো হাজার টাকা ধার নেবার প্রতিশ্রুতি আদায় করা হবে, যা ও মাসে মাসে ফেরৎ পেয়ে যাবে।

ছক অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ ঘড়ির কাঁটার মতন এগিয়ে চললো।

পাত্রীর গার্জিয়ান প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সৌমেন ভট্টাচার্য বরের খোঁজ-খবর নিয়ে মহাখুশি। ভাবি কনেও বিমল মাস্টারের কাছ থেকে ওর বিপদের কথা জেনে শেষ পর্যন্ত বারো হাজার টাকা ধার

দিতে রাজী হয়ে যায়।

শুভদিনে আমাদের সাদামাঠা বিয়ে হয়ে গেল। বিয়েতে ছিল না জাঁকজমক, ছিল না কোন আতিশয্য।

কিছুদিন পর গোমতীর বিয়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেল জাঁকজমক সহকারে।

বনানী ঝালাছড়া থেকে ময়নামার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উৎসবের রোশনাই ছড়িয়ে পথের দুধারে কলাগাছ আর রঙ-বেরঙের কাগজে সাজানো হয়েছে। আনা হয়েছে লাইট-মাইক। আলোক সজ্জায় বিয়ে বাড়ি ঝলমল করছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন বাড়িটা স্বপ্নপুরী হয়ে গেছে।

ভাড়া করা জেনারেটরের কান ফাটানো আওয়াজে ক'দিন এই অঞ্চলের পাহাড়ীদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সুন্দর করে সাজানো-গুছানো হেডমাস্টারবাবুর বাড়িতে শুভদিনে-শুভলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল গোমতী আর অধ্যাপক শৈলেন্দ্র কুমার চাকমার।

সানাই এলো। নহবতের মনমাতানো ছন্দে ওইদিন হেডমাস্টার বাবুর বাড়ি হলো মুখরিত। সঙ্গে চুটিয়ে আনন্দ।

অরিন্দমকে বলা হলো যত খুশি বাজী পোড়াতে আর তনিয়াকে ভার দেয়া হলো প্রচুর দেশী-বিদেশী মদ যোগাড় করতে। কোনদিকেই কিছুর কমতি রাখল না।

বিয়ের শেষে জাতি-উপজাতিদের ভোজের ব্যবস্থা করলাম। ভোজসভায় রাতভোর পর্যন্ত চললো আকণ্ঠ স্ফূর্তি। স্ফূর্তির আমেজে অন্যদের মতন আমিও বেঁহুস। মগ্ন চৈতন্যে সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম গোমতীর সুখী সুন্দর সকালের।

সমাপ্ত